নিউ স্ক্রিপ্ট প্রকাশিত

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

সুবোধ দাশগুপ্ত অলঙ্কৃত

এ ১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ। বৈশাখ, ১৮৮৩ শকাব্দ

প্রকাশক : সুচরিতা দাশ। নিউস্ক্রিপ্ট। ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯

মুদ্রাকর : অমলেন্দু ভদ্র। মুদ্রণ ভারতী। ১৬।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

প্রচ্ছদপট, শীর্ষালঙ্করণ ও অন্যান্য চিত্র : সুবোধ দাশগুপ্ত

ব্লক : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট। ৭।১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা ৬

প্রচ্ছদপট মুদ্রক : দি নিউ প্রাইমা প্রেস। ১১ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ১৩

বাঁধাই : ঘোষ য্যাণ্ড কোম্পানী। সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯

উ ৎ স র্গ

মিঠুকে, ভাস্বতীকে
আর
খুব ছোট্ট ছেলে টুটুলকেও
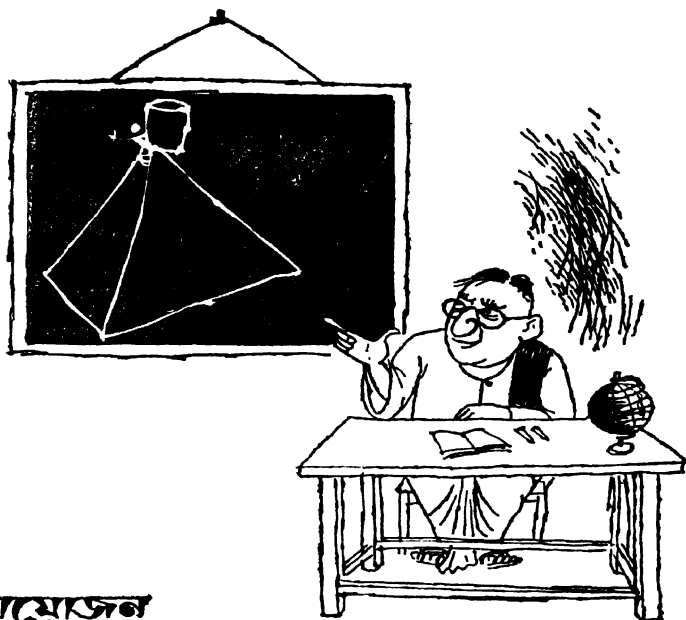
আয়োজন

খবরটা পাওয়া গেল ভূগোলের মাস্টারমশাই হরেনবাবুর মুখ থেকে। প্রথমে তাঁর মুখ থেকে, তারপর যেন রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। হাওয়ায় ছড়াতে ছড়াতে এমন কেউ রইল না যার কানে পৌঁছল না। ছেলে-বুড়ো সবাই যেন কান পেতে রইল, আরো নতুন কি জানতে পারা গেল খবরটার বিষয়ে।

মস্ত বড় ম্যাপ, পৃথিবীর সব দেশের যত রাজ্যের নাম আছে যে নানা রঙের ম্যাপখানার গায়ে, কিংবা একটা গ্লোব, ঘুরিয়ে দিলে পৃথিবীর মতোই ঘুরতে থাকে যে সাদা সুন্দর গ্লোবটা, তাই হাতে ক'রে ভূগোলের ক্লাশে ঢোকেন হরেনবাবু। এ-ছাড়া সাদা, কালো, হলুদ, নানা রঙের চক, সঙ্গে নিয়ে

আসেন। দরকার হলে কালো ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে ছবি আঁকেন। ছবি আঁকতে ওস্তাদ তিনি। ডান-হাত বাঁ-হাত সমান চলে। তীর ধনুক ছুঁড়তে জানলে একালের অর্জুন হতে পারতেন। কথাটা বলেছিল স্কুলের নামকরা ফাজিল ছেলে অমলশংকর। আর তার ওপর টিপ্পনী কেটেছে অমলশংকরের পরের রোল নাম্বার যার সেই শংকর। হরেনবাবু যদি অর্জুন হতে পারেন তো সে কেন মহাভারত লিখবে না। নিদেনপক্ষে তার হাতের লেখাটাও তো পরিষ্কার। ফাজলামিতে অমলশংকরকে সেও ধরি-ধরি করে। বাংলার নতুন মাস্টারমশাই নীলাদ্রিবাবু একদিন ক্লাসে রোল ডাকতে ডাকতে যখন অমলশংকরে এসে থেমেছেন, শংকর তখন তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে বলেছে, ও অমলশংকর স্যার, আর আমি শুধু শংকর।

ক্লাসের ক'জন ফাজিল ছেলে শংকরের কথায় মজা পেয়ে গলা ফাটিয়ে হেসেছে। চোদ্দ বছরের শংকরের ফাজলামি করার সাহস দেখে নীলাদ্রিবাবুর তো চক্ষুস্থির। আর তিনি আরো বুঝেছেন শংকরের দলও কম ভারি নয়।

হ্যাঁ, এই শংকরকেই ডেকে বলেছিলেন হরেনবাবু খবরটার কথা। হরেনবাবুর মতো রাশভারী আর রাগী লোকের সঙ্গে কথা বলার সাহস রাখে একমাত্র শংকরই। যদিও মজারই লোক হরেনবাবু, তবু গম্ভীর মুখচোখের দিকে তাকিয়ে কেউ সাহস ক'রে গোড়ায় কথা বলতে পারে না। কিন্তু একবার যে হরেনবাবুর মনের কাছাকাছি হতে পারে তার আর কোনো ভয় নেই। সবাই অবাক হয়ে ভেবেছে চার-ফুট-আট-ইঞ্চির শংকর ঘোষাল কি ক'রে অমন থমথমে রাশভারী লোক হরেন-বাবুর দিকে মুখ উঁচু ক'রে কথা বলে। হরেনবাবু বলতে সমস্ত

স্কুল একটি মাত্র লোককেই বোঝে, যিনি ডান-হাতের ঘোরানো গ্লোব আর বাঁ-হাতে ম্যাপের ছড়ি ধ'রে চোখ বুজে এত বড় গোটা পৃথিবীটার নাড়ি-নক্ষত্র ব'লে দিতে পারেন। শংকরের মতো ডানপিটে আর ফাজিল ছেলেও অবাক হয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে হরেনবাবু স্যারের দিকে।

ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে পিরামিডের একটা ছবি আঁকছিলেন হরেনবাবু। সবাই তাকিয়ে দেখে কি চটপট ঘুরছে হরেনবাবুর তিন-আঙুলে-ধরা হাতের চক। প্রথমে কয়েকটা আঁকা-বাঁকা এলোমেলো এ-দিক ও-দিক ছড়ানো রেখা, তারপর আস্তে আস্তে সেই ক'টি রেখাই দেখতে দেখতে হয়ে গেল পিরামিডের ছবি। মস্ত বোর্ড জুড়ে পিরামিডের একটা ছবি। ঠিক জিওগ্র্যাফির বইতে যেমনটি আছে। নীলনদের ছবিও আঁকলেন। ঢেউ তুলে এঁকে-বেঁকে চলেছে। তারপর দিলেন পিরামিডের পরিচয়। নীলনদের পশ্চিম তীরে দাঁড়িয়ে আছে। সব চেয়ে উঁচু মাথা যার সেই পিরামিডের উচ্চতা চারশো একাশি ফুট। শুনেই শংকর অস্ফুট উচ্চারণ ক'রে ফেলল, উ-রে বাবা! তারপর মনে মনে একবার আন্দাজ করতে লাগল কত উঁচু। মনুমেণ্টের মাথার দিকে তাকালেই শংকরের মনে হয় মাটির ওপর পা রাখতে পারছে না। ক'টা মনুমেণ্ট গড়ের মাঠের ওই মনুমেণ্টের মাথায় দাঁড় করালে তবে পিরামিডের মাথায় হাত রাখা যাবে। এই না হলে কি আর পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটা হয়েছে! হরেনবাবু অবাক ক'রে দেবার জন্যে আরো খবর দিলেন। তিন লক্ষ লোক লাগিয়ে কুড়ি বছরে শেষ করা হয়েছে এর কাজ। ভাবলে কি সত্যি কারো মাথার ঠিক থাকে! আর তারপর আছে নীলনদের কথা। প্রায়

চার হাজার মাইল লম্বা নদী। কত বড় আকাশ নীলনদের মাথার ওপর পাললা দিয়ে শূন্যে ছুটছে। পিরামিড আর নীল-নদের কথা ব'লে হরেনবাবু এমন ভাবে থেমেছেন ছেলেদের চোখের দিকে তাকিয়ে যে, ভেবে দেখ একবার কি তাজ্জব এই জগৎ!

সবাই যখন পিরামিডের ছবিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে অবাক বনে যাচ্ছে, তখন আরো তাজ্জব বানাবার মতো খবরটা মুখ দিয়ে বার করলেন হরেনবাবু। শংকরের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন হরেনবাবু। তাই শংকরের চোখে চোখ রেখেই বললেন, বুঝলি শঙ্কর, এই পিরামিডের মাথার ওপর একটা লোকের খবর পাওয়া গেছে।

ড্যাবা-ড্যাবা চোখে শংকর গিলছিল হরেনবাবুর কথাগুলো।

ড্যাবা-ড্যাবা চোখে শংকর গিলছিল হরেনবাবুর কথা-গুলো। মনের মধ্যে তার পাক খেয়ে গেল লোকটার কথা এক ধাক্কায়। কি সাজ্ঘাতিক লোকরে বাবা! কিংকং কিম্বা হাতি—তু'টোর কোনো একটা হবে।

আরো অবাক ক'রে দিলেন হরেনবাবু লোকটার পরিচয় দিয়ে।

—ভাবছিস মস্ত জোয়ান হাতি গণ্ডারের মতো কিছু একটা, নারে শংকর? কি যে বলবে শংকর হরেনবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বুঝতে পারে না, তাই বোবা হয়ে থাকে।

আবার বলেন হরেনবাবু, মোটেই নয়। সাড়ে-সাত-ইঞ্চি একটা লোক। খায় কি জানিস? শ' পাঁচেক ফুচকা, আড়াই মন হজমি আর সাড়ে-তিরিশ-সের কড়া চিনেবাদাম'ভাজা।

এতক্ষণ পিরামিডের কথায় সব অবাক হয়েছিল। কিন্তু একটার পর একটা খবর যা দিচ্ছেন হরেনবাবু তাতে তাজ্জব বনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

—বিলিতি একটা কাগজে খবরটা বেরিয়েছে। খুব জোর খোঁজ-খবর চলেছে লোকটা সম্পর্কে। শিগ্‌গির আরো কিছু খবর পাওয়া যাবে; কথা শেষ ক'রে হরেনবাবু চেয়ারে বসলেন।

আরেক নম্বর ফাজিল ছেলে তিমিরবরণ সমানে মিটমিট ক'রে হাসছিল। তার ইচ্ছা করছিল—একবার জিজ্ঞাসা করে হরেনবাবুকে, কোথায় খবরটা বেরিয়েছে স্যার? নেহাৎই হরেনবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে সাহস পেল না। তাকে দিনরাত ঠাট্টা করেছেন হরেনবাবু, ছ' অক্ষরের নাম তোর কে রেখেছে রে? শেষের তিনটে অক্ষর নাম থেকে কেটে বাদ দিয়ে দে।

চটপট উত্তর দিয়ে ফেলেছে তিমিরবরণ, নামে কাটাকুটি করলে, বাবাই কেটে ফেলবে স্যার।

—কি বললি? হুমকি দিয়ে উঠেছেন হরেনবাবু।

—আপনিই স্যার বাবাকে বলবেন, মাথা চুলকোতে চুলকোতে সাহস ক'রে বলেছে কথাগুলো তিমিরবরণ।

হরেনবাবুকে জব্দ করার জন্যে জিওগ্র্যাফির খাতায় সে একবার লিখেছিল, অস্ট্রেলিয়ায় নানা অদ্ভুত ধরনের জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। এক ধরনের সুন্দর প্যাঁচা আছে ইহারা গাছের ডালে বসিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া মানুষের মতো কথা বলে।

রেগে একেবারে তেলে-বেগুনে হয়েছিলেন হরেনবাবু। জিজ্ঞাসা করেছেন, কোথা থেকে পেলি রে তিমির? না তুই নিজেই একখানা জিওগ্র্যাফি লিখছিস?

দু'হাতে কান ঢেকে মুখ লুকিয়ে টিপে টিপে শব্দ না ক'রে হেসেছে তিমিরবরণ।

হরেনবাবু কথাটা আরো পরিষ্কার ক'রে সেই পৃথিবীর সাতটা আশ্চর্যের একটি চারশো একাশি ফুট উঁচু পিরামিডের মাথার ওপরে অষ্টম আশ্চর্য সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার একটা ছবি আঁকলেন। লোকটা পা ঝুলিয়ে ব'সে আছে। এক পাশে ঘাড় কাৎ ক'রে হাত নেড়ে গান গাইছে মনে হয়। পাশে একটা মস্ত জালার মতো। ওরই মধ্যে লোকটার খাবার আছে। শ' পাঁচেক ফুচকা, আড়াই-মন হজমি আর সাড়ে তিরিশ-সের কড়া চিনেবাদাম ভাজা।

পরের পিরিয়ডে মনে আছে ব্যোমকেশবাবু অঙ্ক কষাবার জন্যে একেবারে তৈরী হয়ে ঢুকেছেন। বোর্ডের ওপর চোখ পড়তেই তো হেসে খুন। ব্যোমকেশবাবু কবে কবে হেসেছেন ছেলেরা আঙুলে গুনে বলতে পারে। তারপর ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বোর্ডের গায়ে হাত তুলেছেন মোছবার জন্যে সেটাকে। ছেলেরা সব দল বেঁধে এক সঙ্গে হা-হা ক'রে উঠেছে। চমকে গিয়ে হাত নামিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে

তাকিয়েছেন ব্যোমকেশবাবু। থাক স্যার ছবিটা মুছবেন না, শংকর অনুরোধ করেছে তাঁকে।

—মানে? এমন ক'রে জিজ্ঞাসা করেছেন ব্যোমকেশবাবু, শংকরের কেন শুধু, অমলশংকর আর তিমিরবরণেরও পিলে চমকে উঠেছে। আর কোনো কথা বলতে কেউ সাহস পায় নি।

একটু একটু ক'রে সমস্ত ছবিটা মুছে বোর্ড একেবারে ঝকঝকে ক'রে ফেললেন তিনি। কোথায় বা পিরামিড আর কোথায় বা পিরামিডের মাথার ওপরে সেই সাড়ে-সাত-ইঞ্চি মানুষটা! বেশ ছিল ছবিটা। কোথায় এখন তার জায়গায় শক্ত শক্ত থিয়োরেমের ছবি। শংকরের মুখ দেখেই ওর বন্ধু অমলশংকর বুঝতে পারে বেশ কষ্ট পেয়েছে শংকর মনে মনে। তা ব'লে এও তো আব্দার শংকরের। ব্যোমকেশবাবু জিওমেট্রি বোঝাবেন না? তবু শংকরের দুঃখে অমলশংকর সব সময়েই দুঃখী।

শংকরের মন থেকে কিন্তু ছবিটার কথা কিছুতেই যায় না। জ্যামিতির যে যে ছবি এঁকেছেন ব্যোমকেশবাবু তার মধ্যেই ঘুরে-ফিরে শংকর পিরামিড আর পিরামিডের মাথার ওপরে সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার ছবিই দেখেছে।

শুধু ক্লাশেই নয়, বাড়ি ফিরে রাত্তিরে শোবার সময়ও শংকর ভেবেছে সারাক্ষণ ওই আশ্চর্য লোকটাকে। সাড়ে-সাত-ইঞ্চির লোক, খাওয়ার বহর শুনলে মনে হবে স্যাণ্ডো কিংবা গামা। ভাবতে ভাবতে শংকর ঘুমিয়ে পড়েছে।

মজার একটা স্বপ্ন দেখেছে শঙ্কর। সুন্দর নীলনদের ওপর একটা হালকা নৌকো। সেই নৌকোর ওপর ব'সে আছে সে। কি চমৎকার নীল জল। ঠিক যেমন ছিল রানী ক্লিওপেট্রার

সময়। এই নীলনদের ওপর ময়ূরপঙ্খী নৌকো ভাসিয়ে সুন্দরী রানী ক্লিওপেট্রাকে আজও বুঝি মিশরের গল্প করতে শোনা যাবে। ও মা! তারপর ওটা কি? আরে, হ্যাঁ, তাইতো! সেই সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটাই তো ডাকছে তাকে পিরামিডের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে। আর সেও নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। তারপর সেই ক্ষুদে লোকটার অঙ্গভঙ্গি দেখে হেসে ফেলেছে।

ব্যোমকেশবাবু জিওমেট্রির ক্লাশে যত কথা বলেছেন তার একটিও মনে থাকে না। কেবল মাথার মধ্যে ঘুরেছে পিরামিডের মাথার মানুষটার কথা। আর স্বপ্নটাও মন থেকে তাড়াতে পারে না। হরেনবাবু প্রথম খবরটা দেওয়ার পর এমনি ক'রে পাঁচ-সাতটা দিন কেটেছে।

খবরটার বিষয়ে আরো কিছু সঠিক জানবার জন্যে শংকরের মনটা অস্থির হয়ে রইল। কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকে স্বপ্নটা। খালি সুযোগ খুঁজতে লাগল কি ক'রে হরেনবাবুকে আরেকবার জিজ্ঞাসা করা যায় ওটার বিষয়ে। আর এই করতে করতে একদিন সুযোগও মিলে গেল।

একদিন টিফিনের সময় টিচার্স রুমের কাছে উঁকি-ঝুঁকি মারতে মারতে শংকর চোখে প'ড়ে গেল হরেনবাবুর। শংকর নানা চেষ্টায় কেশে, শব্দ ক'রে, হেঁচে, নটি-বয়-শু-র খটখট আওয়াজ তুলে, হাতের বই ফেলে হরেনবাবুর নজরে পড়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারছিল না। হরেনবাবু গম্ভীর হয়ে সিগারেট টানতে টানতে এমন মেজাজ নিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন যে কোনো কিছুতে হুঁশ ছিল না। তারপর এক সময়ে খরখর শব্দ তুলে কাগজের পাতা ওলটাবার সময়

শংকরের ওপর চোখ পড়ল তাঁর। কেন জানি একটু হেসে কাছে ডাকলেন শংকরকে।

ভরসা পেয়ে শংকর তাঁর কাছে এগিয়ে এল। মনে মনে একবার ভাবল, এই তো চমৎকার সুযোগ মিলে গেছে। যদিও ভরসা পেয়েছে, যদিও মনটা খুশি-খুশি, তবু বুকের মধ্যে একটু-আধটু দুরদুর করছে। কি বলবেন হরেনবাবু কে জানে। হরেনবাবুর হাসিকে কারো বিশ্বাস নেই। আর তার কথাটাও যে শেষ পর্যন্ত সে জিজ্ঞাসা করতে পারবে কিনা তাই বা কে জানে।

হরেনবাবু ওর পিঠে সস্নেহে হাত রাখলেন। বললেন, কিছু দরকার আছে তোর ?

শংকরের তো লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল। তার দরকারের কথাটা হরেনবাবু যেন কি ক'রে জেনে ফেলেছেন।

সে আমতা আমতা ক'রে ব'লে ফেলল, না স্যার, দরকারি কিছু এমন না। আপনাকে একটা কথা শুধু জিগ্যেস করছিলুম···

শংকর একটু থামল। হরেনবাবু অনুমতি দিলেই ব'লে ফেলে আর কি।

—কি বলবি বল, হরেনবাবু ওর পিঠে আস্তে চাপড় দিয়ে বললেন।

—কই স্যার, সেই লোকটার কথা তো আর কিছু বললেন না, একটু ভয়ে ভয়ে শংকর বলল।

—কোন লোকটার কথা বল তো ? হরেনবাবুর কথা শুনে শংকরের মনে হল, কার কথা যে সে জিজ্ঞাসা করছে হরেনবাবু ঠিক বুঝতে পারছেন না।

—ওই যে স্যার, সেই সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার কথা বলছিলেন ?

—ও হো ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভালই হল তুই জিগ্যেস করেছিস। ওই লোকটাকে তো কলকাতায় আনার খুব চেষ্টা করা হবে শুনছি। আমাদের পাড়ার এক কাউন্সিলারের মুখ থেকে খবরটা পেলুম। ভদ্রলোক আমার অনেক দিনের পরিচিত। উনি যা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে খুব হৈ-হৈ ব্যাপার হবে একটা। মেয়র, ডেপুটি মেয়র, অল্ডার-ম্যানদের কেউ কেউ, পাঁচ-দশজন কাউন্সিলার নাকি উঠে পড়ে লেগেছেন। কলকাতা শহরের মতো শহরে ওই রকম মজার কিছু একটা না রাখলে এটাকে আর পৃথিবীর বড় শহর কেউ বলবে না। তা ছাড়া ওঁদের সবাইকার মত হচ্ছে যাতুঘর, চিড়িয়াখানা, মনুমেণ্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বোটানিক্যাল গার্ডেন বা কালীঘাটের মন্দির, এ-সব এখন পুরনো হয়ে গেছে। দেখে দেখে কলকাতার লোকেদের চোখ পচে গেছে। আর হু'-চারটে নতুন জিনিসের আমদানি না হলে এ-শহরে ভদ্রলোক বলতে কেউ থাকবে না। আর সত্যি বলতে লোকে এটাকে পৃথিবীর একটা বড় শহরও বলবে না। শহরটা কেমন যেন মিইয়ে গেছে। লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, টোকিও, বার্লিন এইসব শহরের পাশে এর আর নাম করা চলবে না। কলকাতায় এখন থাকবার মতো আছে শুধু মানুষের ভিড়। সোমবার থেকে শনিবার না হয় বুঝি অফিস, স্কুল, কলেজ, কিন্তু রবিবার ? রবিবারেও কি ট্রাম-বাসে ওঠার জো আছে ? তাই ওঁরা সবাই মিলে ভাবছেন পিরামিডের মাথার ওপর থেকে সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটাকে নামিয়ে আনতে পারলে এ-শহরে দর্শনীয় বস্তু

হবে একটা। এই নিয়ে শিগ্‌গির নাকি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও হবে। বুঝলি এই তো হচ্ছে ব্যাপার! লোকটাকে আনতে পারলে মন্দ মজা হয় না, কি বলিস? হরেনবাবু এতক্ষণে কথা শেষ ক'রে হাতের সিগারেট বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জানলা দিয়ে। কথা বলতে বলতে সিগারেট খাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। হাতের মধ্যেই সিগারেটের অনেকখানি পুড়ে গেল। হরেনবাবু তাই আবার একটা নতুন সিগারেট ধরালেন।

হরেনবাবুর মুখ থেকে শংকর খবরটা পাওয়ার পরই যেন উৎসাহে দ্বিগুণ হয়ে উঠল। খুব অবাক অবাক মুখ ক'রে শংকর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মজার খবরটার খুশিতে ওর মন কিন্তু ডগমগ করে। হরেনবাবু ওর মুখের চেহারা দেখে যেন মনের অবস্থাটা ধ'রে ফেলেন। শেষে হেসে বলেন, আচ্ছা আজ যা।

যেতে বললে সে হরেনবাবুর সামনে থেকে স'রে যায় বটে, কিন্তু ওর মন থেকে তো তাঁর কথাটা কিছুতে যায় না।

যে স্বপ্নটা শংকর দেখেছিল সেইটাই আবার দেখল সে এক রাত্রে।

সেই গাঢ় নীল রঙের জল আর তার ওপর ঝকঝকে চাঁদের আলো পড়েছে। নীলনদ আরো বেশি উজ্জ্বল নীল মনে হচ্ছে। ঠিক সিনেমায় যেমন রঙীন ছবি দেখে তেমনি। আর সেই নীলনদের ওপর সুন্দরী রানী ক্লিওপেট্রার বজরা ঢেউয়ের ওপর থেকে থেকে তুলছে। সব চেয়ে আশ্চর্য হল শংকর নিজে জলের মধ্যে সাঁতার কাটছে। একবার ডুব দিয়ে নীল জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার মাথা তুলে মুখ

দিয়ে ভুসভুস ক'রে পিচকিরি থেকে জল ছোঁড়ার মতো জল ছুঁড়ছে। হঠাৎ শংকর এমনি ক'রে ভাসতে ভাসতে, জলে ডুবে আবার মাথা তুলে ক্লিওপেট্রার বজরার কাছে এসে জলের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ভাসতে থাকে। রানী ক্লিওপেট্রার নজর পড়ল শংকরের ওপর। হাসতে হাসতে শংকরের দিকে চেয়ে ক্লিওপেট্রা যেন হাত নেড়ে তাকে ডাকছেন। শংকরের বিশ্বাস হয় না। মিশরের রানী ক্লিওপেট্রা তাকে ডাকছেন। ওই তো পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে ক্লিওপেট্রার গলার স্বর। তাঁকে বলছেন, খুব সাহস তো তোমার, কোন দেশের ছেলে তুমি? আর শংকরের নিজের গলার স্বরও তো শংকরের কানে যায়। সে স্পষ্ট উত্তর দিল, আমি ইণ্ডিয়ান। খুব খুশি হলেন যেন রানী ক্লিওপেট্রা। মুখ দেখে শংকরের তাই মনে হল। আবার জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, এখানে এসেছ কি কাজে? আর রানীর কথা শুনেই তার চোখ গিয়ে পড়ল পশ্চিম তীরে। ওই তো সব চেয়ে উঁচু পিরামিডটার মাথার ওপর ব'সে সেই সাড়ে-সাত-ইঞ্চির লোকটা হাত-পা দুলিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে ফুচকা খাচ্ছে। সারা দিনে খায় পাঁচশো ফুচকা। বাব্-বা! খাইয়ে বটে। সে লোকটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। রানী ক্লিওপেট্রা তাড়াতাড়ি তাঁর কোমরের কাছ থেকে একটা দুরবীন বার ক'রে পিরামিডের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপরই হেসে লুটোপুটি খান। এইবার শংকর ক্লিওপেট্রার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে চেঁচিয়ে বলে, ওই লোকটাকে নামিয়ে আনবার জন্যে আমি এসেছি—শুনছেন? কি যেন একটা বলতে গেলেন ক্লিওপেট্রা তার দিকে ফিরে, শংকর শোনবার আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু কিচ্ছু শুনতে পেল না। কারণ ঠিক এই সময়েই স্বপ্নটা ভেঙে গেল।

আর সত্যি বলতে কি শংকরের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। তার কথা শুনে কি বলেন তাকে ক্লিওপেট্রা, তার ভারি ইচ্ছে ছিল শুনতে। স্বপ্নটার কথা স্কুলে গিয়ে একবার অমলশংকরকে না ব'লে তার শান্তি নেই। তিমিরবরণকে বলবে না। বললে আর রক্ষে নেই। সারাদিন জ্বালিয়ে মারবে।

শংকর পরের দিন স্কুলে এসে ঠিক করল টিফিনের সময় চার পয়সার হজমি কিনে তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে মজা ক'রে মজার স্বপ্নটার গল্প করবে অমলশংকরের কাছে। শুনে তাজ্জব বনে যাবে। এমন মজার স্বপ্ন অমল দেখেছে কখনো?

ফার্স্ট পিরিয়ডে শংকর ব'সে ব'সে ভাবছিল কথাটা। শুনে আবার বলবে না তো তিমিরবরণের কানে কানে? তাহলে সমস্ত স্কুলে রটিয়ে দেবে কথাটা।

কিন্তু টিফিনের আগের পিরিয়ডেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

সংস্কৃতর ক্লাস হচ্ছিল নিখিলেশ্বরবাবুর। পরস্মৈপদী আর আত্মনেপদী ধাতুরূপের ব্যাপার। পরস্মৈপদী যদিও বা মুখস্থ করতে পারে শংকর আত্মনেপদী রূপ আর কিছুতেই মনে থাকে না। সংস্কৃত ব্যাকরণের এক-একটা ক্লাশ নয়তো, শংকরের জীবনের এক-একটা ফাঁড়া। এক-একটা ক্লাশ থেকে মুক্তি পাওয়া মানে এক-একটা ফাঁড়া কাটানো। আজও কি ক'রে যে শংকর তালেগোলে কাটিয়ে দেবে ক্লাশটা তারই চিন্তা করছিল। নিখিলেশ্বরবাবুর পাল্লায় পড়া সোজা কথা নয়। পাঁচশো উনত্রিশ রকমের শাস্তি এ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করেছেন। পর পর বলে যান তিনি অনেক সময় শাস্তিগুলোর

নাম। এক নম্বর ভেলকি ঘুঁষি, দু' নম্বর ফাজিল চাঁটি, তিন নম্বর চাপাটি কিল, চার নম্বর চীনে চিমটি, পাঁচ নম্বর বুনো ঘুঁষি, এই রকম ক'রে নাকি পাঁচশো উনত্রিশ নম্বর পর্যন্ত পৌঁছেছেন। য়্যালজেবরা বা য়্যারিথমেটিকের ফরমুলা কিংবা হয়তো সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র যদিও বা কারো মনে থাকে, নিখিলেশ্বরবাবুর শাস্তির ফরমুলা মনে রাখা অসাধ্য। তিমিরবরণ একবার চেষ্টা করেছিল, অনেকখানি এসেও শেষ পর্যন্ত পারে নি। তবু তার চেষ্টার জন্যেও নিখিলেশ্বরবাবু তার ওপর সদয়। মাঝে মাঝে দু'-চার নম্বর কম পেলে তিনি তাকে সংস্কৃতয় পাশ করিয়ে দেন। ভাগ্যে নিচু ক্লাশগুলোয় সংস্কৃত নেই। অবিশ্যি থাকলেও ও-সব ক্লাশে খুব একটা ভয়ের কিছু নেই। নিচু ক্লাশে নিখিলেশ্বরবাবু সাধারণত ভেলকি ঘুঁষি আর ফাজিল চাঁটিই ব্যবহার ক'রে থাকেন। ওতে নাকি ঘাবড়িয়ে যায় ছেলেরা, গায়ে লাগে না কিছু। তাদের ক্লাশ এইটে সাধারণত চীনে চিমটি বেশি ব্যবহার করেন। এটা এদেশের ও চীনদেশের চীনে স্কুলে খুব বেশি চলে। বুনো ঘুঁষি আর চাপাটি কিল নাকি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। প্রাণ-হানির সম্ভাবনা আছে ব'লেই হয়তো নিখিলেশ্বরবাবু ও-দু'টো মোটেই ব্যবহার করেন না। ছেলেরা গল্প শুনেছে অনেকদিন আগে ঘনশ্যামসুন্দরচিত্তকে একবার বুনো ঘুঁষি মেরেছিলেন। ঠিক নাকের ডগা বেয়ে ঘুঁষিটা নাক বরাবর কপালের ওপর উঠে যায়। তারপর কপালের ওপর থেকে একটু চুল তুলে নিয়ে ঘুঁষিটা একটা উড়ন্ত চড়ুইয়ের বেগে কোথায় মিলিয়ে যায়। ঘনশ্যামসুন্দরচিত্তরও তাই হয়েছিল। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল স্কুলে প্রায় ঘণ্টা তিনেক। সেই থেকে নিখিলেশ্বর-

বাবু ওটাকে শাস্তির তালিকায় নাম হিসেবেই শুধু রেখেছেন।

এই নিখিলেশ্বরবাবুর ক্লাশে ব'সেই ভাবছিল শংকর এত কথা। কিন্তু তার ভাবনার মাঝখানে এসে বাধা দিল দারোয়ান শিউনন্দন। নিখিলেশ্বরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, শংকর ঘোষাল, হরেনবাবু ডাকছান।

শংকর প্রথমটা ঘাবড়িয়ে যায়। হঠাৎ আবার এ সময়ে ডাক পড়ল কেন। তিমিরবরণ তার নামে আবার ফাজলামি ক'রে কিছু বলেছে নাকি হরেনবাবুকে, স্যার শংকর বলছে খবরটা সত্যি নয়। তা হলে তো রক্ষে নেই।

অনুমতির জন্যে সে নিখিলেশ্বরবাবুর মুখের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিয়ে তিনি শংকরকে বললেন, যা।

ক্লাশ থেকে বেরুবার সময় সে তিমিরবরণের মুখের দিকে একবার তাকালো। কিন্তু তিমির তার মুখের দিকে চেয়ে মিটমিট ক'রে হাসল কেন! তাইতেই শংকরের আরো বেশি ভয় হল।

টিচার্স রুমে হরেনবাবু দু'টো চেয়ার জুড়ে বসেছিলেন। সিগারেট খাচ্ছিলেন আর বোধ হয় চিঠি লিখছিলেন কাউকে। শংকর আস্তে-আস্তে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো। হরেনবাবু যেন দেখেও দেখলেন না। শংকর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি চিঠি শেষ ক'রে এইবার বুঝি তার মুখের দিকে তাকাবার সময় পেলেন।

—ডাকছিলেন স্যার? শোনা যায় না প্রায় এমন গলায় শংকর ভয়ে ভয়ে বলল।

—হ্যাঁ, হেডমাস্টারমশাইকে ব'লে তোকে একবার ডেকে পাঠালুম। কথাটা শেষকালে ভুলেই যাব আর আজকাল যা

ভুলো মন হয়েছে! ওই লোকটাকে কলকাতায় আনার যে খবর শুনেছিলুম সেটা একেবারে খাঁটি। আমার বন্ধু কাউন্সিলারটির সঙ্গে কালও দেখা হয়েছে। একজন চটপটে চালাক-চতুর ছেলে খোঁজা হচ্ছে। পশ্চিম বাংলারই ছেলে হওয়া চাই। কারণ কলকাতার মেয়রও আছেন ঐ ব্যাপারটার পিছনে। আমার কি জানি তোর কথাই মনে পড়ল। হ্যাঁ, ভাল কথা পশ্চিম বাংলার স্কুলের ছেলেদের মধ্যেই একটা বাছাই হবে। প্রজ্ঞানারায়ণবাবু, মানে আমার ওই কাউন্সিলার বন্ধুটি আর কি, বলছিলেন ধরা-কওয়ার ব্যাপার আছে। তবে সে রকম দেখতে-শুনতে চালাক-চতুর ছেলে হলে তিনি মেয়রকে একবার ধরবেন। যাই হোক পুশ করবার লোক আছে। এখন দরকার হচ্ছে সাহস ক'রে তোকে কয়েকটা ব্যাপারে তৈরী হতে হবে।

শংকর কান খাড়া ক'রে শুনছিল হরেনবাবু স্যারের কথা-গুলো। হরেনবাবু একটু থামলেন। দম নেবার জন্যেও বটে আর সিগারেট ধরাবেন ব'লেও বটে।

তারপর সিগারেট ধরানো শেষ ক'রে, তিনি তার দিকে ফের মুখ তুলে বললেন, আজ কি তুই খেলার মাঠে যাবি নাকি?

—কেন স্যার? শংকর খুব বিনয়ী হয়ে বলে।

—না, মানে তুই খেলতে বা খেলা দেখতে তো রোজই যাস, হরেনবাবু খুব আস্তে আস্তে ছেড়ে ছেড়ে একটি একটি ক'রে বলেন কথাগুলো।

—না স্যার, রোজ আর কোথায় যাই, এমন সভয়ে শংকর বলে যে, আজ দরকার হলে সে নাও যেতে পারে। অর্থাৎ রোজ যাই বললে যদি তিনি আবার কথা ঘুরিয়ে নেন।

হরেনবাবুর মুখ দেখে মনে হয় তিনি তার কথায় আশ্বস্ত হয়েছেন।

—তাহলে এক কাজ করিস, আজ ছুটির পর আমার বাড়ি আসিস। তোকে এ বিষয়ে দু'-চারটে দরকারি কথা বলব। যা, ক্লাশে যা।

কথা শেষ ক'রে হরেনবাবু পকেট থেকে লেখা চিঠিখানা আবার বার করেন। বোধ হয় এখনো শেষ হয় নি লেখা।

—নিশ্চয় যাব স্যার, ঘাড় একেবারে কাত ক'রে শংকর গ'লে যাওয়ার মতো ক'রে বলে। ফেরার মুখে একবার হেডমাস্টারমশায়ের ঘরের দিকে উঁকি দেয়। খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে উঁচুতে টাঙানো দেয়াল-ঘড়ি চোখে পড়ে। মনে-মনে শুধু ভাবে, বাঁচা গেল, যাক আর মাত্র বার মিনিট আছে নিখিলেশ্বরবাবু ক্লাশ শেষ হতে। এখন ক্লাশে ঢুকলে কি আর নিখিলেশ্বরবাবু তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন।

ও ক্লাশে ঢোকবার পর অমলশংকর আর তিমিরবরণ দু'জনে শুধু একবার চোখে চোখে চাইল। কি ভাবছে ওরা? ভাবছে হরেনবাবু ওকে ডেকে বলেছেন, ব্যোমকেশবাবু আমায় বলছিলেন ক্লাশ এইটের ছেলেগুলো একেবারে মাথায় উঠে বসেছে। আর বেশি ক'রে বলেছেন শংকরের নামে। নাও এখন ঠেলা সামলাও। খুব ছোো সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটাকে নিয়ে লাফালাফি। যত আজগুবি কাণ্ড। যা খুশি ভাবুক ওরা। এখন কিচ্ছুটি বলবে না শংকর। সব জানতে তো পারবেই ঠিক সময়ে।

টিফিনের সময় অমল তাকে একবার জিজ্ঞাসা করল, কি জন্যে তাকে ডেকেছিলেন হরেনবাবু। অমলের প্রশ্নের উত্তরে

ও স্রেফ একটা ধাপ্পা দিল। হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন ও কবে থেকে হরেনবাবুর কোচিং ক্লাশে ভর্তি হবে। কারণ বেশি ভিড় বাড়াতে চান না তিনি। কথাটা বলার মধ্যে শংকরের অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল। যে হরেনবাবু তার প্রতি এত সদয় হয়েছেন তাঁর কোচিং ক্লাশে অমল আর তিমির যদি ভর্তি হয়তো ভালই। কারণ আর দু'-চারজন মাস্টারমশায়ও কোচিং ক্লাশ চালান। তার হঠাৎই মনে হল হরেনবাবুর কোচিং ক্লাশেই বেশি ছেলে ভর্তি হলে ভাল। কারণ জিওগ্র্যাফিতে নাকি আজকাল খুব বেশি ছেলে ফেল করছে। নিখিলেশ্বরবাবু যতই বলুন না কেন সংস্কৃতে যত ছেলে গোল্লা পায় অঙ্কেও তত পায় না।

স্কুলের ছুটির পর শংকর আজ একবার বাড়ি ফেরার কথাও ভুলে গেল। মাঝে মাঝে দেরি ক'রে বাড়ি ফিরলে মা-র কাছে শংকরকে একটা ভাল মতো কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কোনোদিন বলেছে, আজ একটা চ্যারিটি ম্যাচ ছিল আমাদের। আমি না খেললে তো আবার খেলাই হয় না। মোহনবাগান গ্রাউণ্ডের পিছনের খোলা মাঠটায় খেলা ছিল। ভীষণ ভিড় ট্রামে। উঠতে পারলুম না। হেঁটেই ফিরলুম।

একদিন অমল কোথা থেকে সিনেমার দু'খানা টিকিট জোগাড় ক'রে নিয়ে এল। শংকর বলল, একবার বাড়িতে ব'লে যাব না অমল?

অমলশংকর তার উত্তরে বলেছে, দূ-র, একটা গুল চালাবি। আমি তো একটা জোর গুল দেব। বলবি ক'টা খুব শক্ত অঙ্ক দিয়েছিল ব্যোমকেশবাবু। না করলেই নয়। তাই দু'জনে মিলে ছুটির পর আমাদের বাড়িতে ব'সে অঙ্ক কষছিলুম।

শংকরও বাড়িতে ফিরে সেই রকমই বলেছিল গুছিয়ে-গাছিয়ে। শংকরের মা প্রথম যে একটু সন্দেহ করেন নি তা নয়। তারপর ভেবেছেন হু'বার পর পর অঙ্কে ফেল নম্বর পেয়ে সে হয়তো সত্যি সত্যিই অঙ্ক কষায় মন দিয়েছে। খুশিই হয়েছেন কথাটা ভেবে।

ধরাও যে পড়ে নি হুয়েকবার তাও নয়।

একবার ফুটবল খেলার চ্যারিটি ম্যাচ দেখার পর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই খেলা ভাঙার পর গড়ের মাঠে সে, অমলশংকর আর তিমিরবরণ তিনজনে মিলে মৌজ ক'রে চিনে-বাদাম ভাজা খেতে খেতে পা-ছড়িয়ে খেলার গল্প করছিল পরম উৎসাহে। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল। ভালই লাগছিল ক্লান্তি জুড়োতে। গায়ের ঘাম ম'রে যাবার পর তিনজনে যখন গড়ের মাঠ থেকে উঠল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে একটা মিথ্যে কথা বানিয়ে বলতে হবে। কী বলবে মাকে ? শংকরের মাথায় একটা ফন্দিও এসে গেল।

মাকে সে বাড়ি ফিরে বলল, ছোট মেশোমশায়ের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। ছোটমাসি তাকে অনেকদিন দেখে নি, মেশো-মশায় ধ'রে নিয়ে গেলেন। তাই ফিরতে এত দেরি হয়ে গেল।

কিন্তু এমনি হুর্ভাগ্য শংকরের যে ঘটনাটার ক'টা দিন পরেই ছোটমাসি আর ছোট মেশোমশায়ের হঠাৎ আবির্ভাব এক সঙ্গে। শংকর তো ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েই দে ছুট। কি সর্বনাশ !

রাত্তিরবেলা মা একচোট নিল খুব। শংকর এটা-ওটা

ব'লে মা-র মন ভিজিয়ে পা জড়িয়ে ধ'রে মাপ চেয়ে নিল ভাল ক'রে। সে যখন দুষ্টু ফন্দি আঁটে না তখন তার মুখ দেখে সকলেরই মায়া হয়। মা-রও মন তাই ভিজে গেল। হেসে ফেলে তিনি শংকরকে ক্ষমা করেছেন শেষ পর্যন্ত।

হরেনবাবুর বাড়ির সামনে এসে দেখে দরজা বন্ধ। এর আগে সে একা কখনো আসে নি তাঁর বাড়িতে। ভূগোলের নম্বর জানতে বা সাজেস্‌শন্‌স চাইতে সে, অমল আর তিমির কখনো-সখনো এসেছে। সে আর অমলশংকর ভিতরে ঢুকেছে, আর তিমিরবরণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। কিছুতেই ভিতরে ঢোকে নি।

আজ হরেনবাবুর বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার বুক কেমন দুরদুর করতে থাকে। তাঁর বড় ছেলে কোন কলেজের প্রফেসর নাকি। হরেনবাবুর চাইতেও আরো বেশি গম্ভীর চোখে তাকান। দরজা খোলার পরই যদি চোখে প'ড়ে যায় তাঁর? যদি জিজ্ঞাসা করেন, কী চাই?

না। তার চেয়ে রাস্তার সামনের জানলাটার খড়খড়িটা আস্তে তুলে দেখে নেওয়া ভাল। বাইরের ঘরে হরেনবাবু আছেন কিনা।

ও খড়খড়িটা একটু তুলল, তারপর শব্দ না-ক'রে উঁকি মেরে দেখল হরেনবাবু একটা সিল্কের লুঙ্গি প'রে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বুজে রয়েছেন।

শংকর তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে এল জানলার ওপর, তারপর খুব মিহি গলায় বলল, স্যার, আমি এসেছি।

কি আশ্চর্য! শংকরকে আর দ্বিতীয়বার বলতে হল না।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকালেন হরেনবাবু জানলার দিকে। ঠিক বুঝি তারই কথা ভাবছিলেন।

—তুই এসে গেছিস। তোর কথাই ভাবছিলুম। বাইরে কেন, ভেতরে আয়, খুব নরম গলায় আদর ক'রে বললেন তিনি।

নিশ্চয় তিনি তারই কথা ভাবছিলেন। না হলে শংকরের এক ডাকে সাড়া দিলেন কি ক'রে।

—দরজা বন্ধ স্যার, সে প্রায় শুনতে না পাওয়ার মতো ক'রে বলে।

তবু ঠিকই শুনতে পেলেন হরেনবাবু। চাকরকে দরজা খুলে দেওয়ার জন্যে হাঁক দিলেন। দরজা খোলা পেয়ে শংকর ঠিক গ'লে যাওয়ার মতো ঢুকে গেল। সোজাসুজি এসে দাঁড়ালো হরেনবাবুর মুখোমুখি।

—দাঁড়িয়ে কেন? বোস, হরেনবাবু সামনের একখানা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন তাকে। এমন ক'রে হরেনবাবু চট ক'রে কাউকে বসতে বলেন না। ভূগোলে যারা অনেক নম্বর পায় একমাত্র তাদেরই শুধু খাতির ক'রে বসতে বলেন। অনেকদিন আগে ক্লাশ টেনের হলুদচরণকে একবার হরেনবাবুর এই ঘরে দেখেছিল। খুব খাতির ক'রে হরেনবাবু তাকে এস বাবা, বসো বসো, ব'লে বসতে দিয়েছিলেন তাঁর এই চেয়ারে। পৃথিবীর মস্ত বড় একখানি ম্যাপ তাকে উপহার দিয়েছিলেন নিজের হাতে। ভূগোলে নাকি অনেক নম্বর পেয়েছিল হলুদচরণ ফাইনাল পরীক্ষায়। হলুদচরণের সেই চেয়ারে এখন সে ব'সে আছে। শংকরের মনে মনে একটু গর্ব হল সত্যিই। সে বুঝি সত্যি সত্যি বড় একটা কিছু করতে যাচ্ছে।

শংকর ভাল ক'রে গুছিয়ে বসার পর হরেনবাবু আসল কথা শুরু করলেন।

—তোর কথাই আমি ভেবে দেখলুম, শংকর বুঝলি ? চেষ্টা করলে তুই-ই পারবি। সাহস তোর আছে, আর তুই চটপটেও আছিস্। খালি একটু মনে জোর আনতে হবে। কি, পারবি না ?

—পারব স্যার, শংকর মাথা নাড়ল।

—আগে শুনে নে, মাথা নাড়িস নে, হরেনবাবুর কথায় শংকর একটু লজ্জা পেল।

—প্রজ্ঞাবাবু যা বললেন তা থেকে মনে হয় একবার যদি কোনো উপায়ে কাজটা চুকিয়ে ফেলতে পারিস তো মস্ত বড় একটা কাজ হয়। মনে হয় তোর মতন চালাক-চতুর ছেলে পেরে যাবে। শোন।

—একটা সিলেকশনের মতো হবে। মানে নির্বাচন, বুঝতে পেরেছিস। ধর বাছাই ক'রে শেষ পর্যন্ত পাঁচশো ছেলে হবে। তার মধ্যে থেকে তোকে বাছাই করা হবে। খুব একটা শক্ত কিছু হবে না। তবে তোর মনের জোর আর সাহসের ওপর নির্ভর করছে অনেকখানি। নার্ভাস হলে চলবে না। দু'রকমের পরীক্ষা হবে, বুঝলি। একটায় তুই ভালই করবি। আমার ভাবনা আরেকটা নিয়ে। লোকটা চোদ্দটা ভাষায় গান গায় জানিস তো ?

—না স্যার, জানি না। শংকর মাথা নেড়ে জানালো সে জানে না। অর্থাৎ খবরটা সে শোনে নি।

—ও ! তোকে বলি নি বুঝি ! লোকটা চোদ্দটা ভাষায় গান গায়। সব ভাষাগুলোর দরকার নেই, মোটামুটি পাঁচ-

সাতটা ভাষায় দু'-চারটে খাতিরের কথা শিখে রাখতে হবে। লোকটা কোন ভাষায় গান গাইছে তোকে বুঝে নিতে হবে। তারপর সেই ভাষায় তারিফ ক'রে খাতির ক'রে তোকে দু'টো-একটা কথা বলতে হবে। লোকটা যাতে বুঝতে পারে তার গান তোর ভাল লেগেছে। সেই জন্যে তোর আগে দরকার ওই পাঁচ-সাতটা ভাষার কতকগুলো দরকারি শব্দ জেনে মুখস্থ রাখা। সংস্কৃত ব্যাকরণ মুখস্থ রাখিস আর এটা পারবি না?

হরেনবাবুর কথা শুনতে শুনতে শংকরের মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণের কথা কানে যেতে মুখের অবস্থা এমন বেকায়দায় দাঁড়ালো যে সে যেন বলতে চায়, বেশ তো বলছিলেন স্যার, আবার নিখিলেশ্বর-বাবুর সংস্কৃতর কথা কেন? নিখিলেশ্বরবাবুর সংস্কৃতর ক্লাশে ব'সে তার এক একদিন মনে হয়েছে, এই সংস্কৃত ছাড়া যে কোনো ভাষা সে চেষ্টা করলে শিখতে পারে।

হঠাৎই শংকরের কি যেন মনে হল, সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটা যদি সংস্কৃত ভাষায় গান গায়? তারপর ভাবল নিখিলেশ্বরবাবুর কাছে যতটুকু সংস্কৃত শিখেছে তাতে কি আর সে ওই লোকটার গান বুঝতে পারবে না, দু'-চারটে কথাও বলতে পারবে।

—কি চুপ ক'রে আছিস যে? আবার জিজ্ঞাসা করলেন হরেনবাবু।

—না স্যার, পারব না কেন। চেষ্টা করলে পেরে যাব মনে হয়, শংকর এমন গম্ভীর হয়ে বলে যে হরেনবাবুর তার কথায় বিশ্বাস না হয়ে পারে না।

—তাই বল। গোড়া থেকে সাহস না আনলে চলবে কেন? হরেনবাবুর গলার স্বরে ওর মনে হল তিনি ওর কথা তারিফ করছেন।

—হ্যাঁ, আরেকটা যে পরীক্ষা, তা তুই ভালই পারবি। গেমটিচার ঈশ্বরভক্তবাবুর কাছ থেকে একখানা ভাল সার্টিফিকেট জোগাড় ক'রে নে। তা ছাড়া তোর তো সার্টিফিকেট টেস্টিমোনিয়াল আর প্রাইজও আছে অনেক স্পোর্টসের। তার থেকে কিছু কিছু বাছাই ক'রে রাখবি। কিছু না। তবে খুব চটপটে আর সাহসী না-হলে চলবে কেন? সেই সবই টেস্ট করবে।

হরেনবাবুর কথায় ওর আবার গর্ব হল মনে মনে। বললে, না স্যার. ও-সব আমার রেডি করা আছে। আর ঈশ্বরভক্তবাবুকে বললে আমায় খুব ভাল আর বড় সার্টিফিকেট লিখে দেবেন। ঈশ্বরভক্তবাবু ইয়া লম্বা চওড়া আর গালপাট্টা চেহারা দেখে সবাই সন্দেহ করে তিনি বাঙালী নন। আর তিমিরবরণ নাকি কোথা থেকে তাঁর আসল নামটাও জোগাড় করেছে। তাঁর আসল নাম হল ঈশ্বরভকত্। অমল বলেছে, ওটা কি বাঙালী নাম? ঈশ্বরভকত্ থেকেই নাকি ঈশ্বরভক্ত হয়েছে। যাই হোক ঈশ্বরবাবুকে বলতে হবে একখানা সার্টিফিকেটের জন্যে।

ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হরেনবাবুর যেন কি ভাবলেন, তারপর বললেন, সে সব আমি জানি। আর সেই জন্যেই তোকে বলছি, একবার চেষ্টা ক'রেই দেখ না। হ্যাঁ, ওই চোদ্দটা ভাষার ব্যাপারে আমাদের স্কুলের প্রফুল্লবিকাশবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করবি, বুঝলি? উনি এ বিষয়ে পাকা লোক। আমি ওঁকে তোর কথা ব'লে রাখব।

স্কুলের ইংলিশের সিনিয়র টিচার প্রফুল্লবিকাশবাবুর মতো পণ্ডিত লোক আর কে আছে। প্রফুল্লবিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা করবে এ-কথা ব'লে শংকর সেদিনের মতো হরেনবাবুর বাড়ি থেকে ফিরল।

তবু শংকর খবরটা চেপেই রাখল। যদিও এত কথা বললেন হরেনবাবু, এত ভরসা দিলেন, তবু তার মনে মনে ভয় রইল যদি ফসকে যায় সুযোগটা। শেষকালে কি লোক হাসাবে। খবরটা তো কিছুদিন পরে জোরালো হয়ে বেরুবে, আর তখন সে যে এইজন্যে তৈরী হচ্ছে সে কথাও কি আর চাপা থাকবে। তখন তো সব জানাজানি হবে। সেই ভাল এখন সে অমল কি তিমিরবরণকেও কিছু জানাবে না।

তাই তাকে সেদিন খেলার মাঠে যেতে না দেখে অমলশংকর যখন জিজ্ঞাসা করল, কোথায় গিয়েছিলি রে কাল? শংকর প্রথমটা ঘাবড়ে যায়, তারপর সামলে নিয়ে আমতা আমতা ক'রে বলে, কাল সত্যিই ছোটমাসির ওখানে গিয়েছিলুম।

—আবার পুরনো গুল আমার কাছে চালাচ্ছিস? অমল বিশ্বাস না করার মতো ক'রে তচ্ছুপে বলে।

—না, এবার মিথ্যে কথা বলছি না, তুই বিশ্বাস কর, এমন ভাবে তাকালো ও অমলের দিকে যেন ওর মুখ দেখে দয়া হল অমলের, মনে হল সে শংকরের কথা বিশ্বাস করেছে।

যাক আপাতত বাঁচল সে অমলশংকরের হাত থেকে। এখন কি ক'রে একবার প্রফুল্লবিকাশবাবুর কাছে পৌঁছনো যায়।

হরেনবাবু গম্ভীর স্বভাবের হলেও মাঝে মাঝে সদাশয় ব্যক্তি মনে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু ইংলিশের সিনিয়র টিচার প্রফুল্লবিকাশবাবু? প্রফুল্লবিকাশবাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হলে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর তো প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় পাবে শংকর সে সাহস? সামনা-সামনি গিয়ে তো দাঁড়ানো যাবে না। পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ারে হাত রাখতে হবে, তারপর অনেকক্ষণ পর ঘাড় ফিরিয়ে প্রফুল্লবিকাশবাবু পিছনে তাকাবেন। নস্যি টানেন কখনো কখনো, আর সর্বদা মুখের কড়া পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়ছেন। খুব খাতির তাঁর হেডমাস্টারের কাছে। সেক্রেটারীমশাই, তিনিও খুব খাতির করেন প্রফুল্লবিকাশবাবুকে। তাঁকে ক্লাশে প্রায় যেতেই হয় না। মাঝে-মধ্যে ওপরের ক্লাশের ছেলেদের তুয়েকটা ক্লাশ নেন। আর না হলে লাইব্রেরী রুমের এক কোণে আরাম-কেদারায় পা ছড়িয়ে গা ঢেলে শুয়ে সারাক্ষণই বই পড়েন। আর লেখাজোকা করেন। কেউ বিরক্ত করে না। উঁচু ক্লাশের তু'-পাঁচজন ভাল ছেলেদের নিয়ে এই লাইব্রেরী ঘরে ব'সেই ক্লাশ নেন। হেডমাস্টারমশাই কোনো পরামর্শের দরকার হলেই ছুটে যান প্রফুল্লবিকাশবাবুর কাছে। কি ক'রে সে একলা গিয়ে দাঁড়াবে তাঁর সামনে? হরেনবাবু কি তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে বলেছেন, না সত্যিই ব'লে রেখেছেন তার বিষয়ে। একবার দেখাই যাক না প্রফুল্লবিকাশবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে। মুখের অবস্থা আর হাবে-ভাবে বোঝা যাবে তিনি ওই সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার খবর পেয়েছেন কিনা।

লাইব্রেরী ঘরের সামনে এসে শংকর উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল। কই ইজিচেয়ারে তো প্রফুল্লবিকাশবাবুর চিহ্নটি

নেই। হরেনবাবু তাকে এত খবর দিয়ে উৎসাহ ক'রে শেষকালে ওই কথাটাই কি···শংকর কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারে না হরেনবাবু স্যারকে। প্রফুল্লবিকাশবাবুকে দেখতে না পেয়ে তার প্রায় কান্না পায়, শেষকালে কি তাঁরই জন্যে সব কিছু চাপা প'ড়ে যাবে।

দারোয়ান শিউনন্দনকে সামনে দেখতে পেয়ে শংকর জিজ্ঞাসা করল নিচু গলায়, প্রফুল্লবাবু এখনো আসেন নি দারোয়ান ?

প্রফুল্লবিকাশবাবুর সঙ্গে শংকরের মতো চার-ফুট আট-ইঞ্চি, চোদ্দ বছরের ছেলের যে কি দরকার থাকতে পারে শিউ-নন্দন তা ঠাওর করতে পারে না। খুব অবাক হয়ে তাই জিজ্ঞাসা করে, কী হোবে—এখোনো আসেন না।

—আজ আসবেন না ? প্রফুল্লবিকাশবাবু আজ না এলে শংকরের যে কি ক্ষতি হতে পারে তা শিউনন্দন অনুমানও করতে পারে না। শংকরের গলার স্বরে, মুখের চেহারায় দারোয়ানের তাই তো মনে হল।

—আসবান আসবান, এত তাড়া কেন, দারোয়ান শিউনন্দন তাকে ভরসা দেয়। আর সবায়ের মতো শিউনন্দনও প্রফুল্লবিকাশবাবুকে খুব সমীহ করে। প্রফুল্লবিকাশবাবুর সব খবরই সে রাখে। যদি না আসবার হত দারোয়ান খবর দিত।

ঘণ্টা দেওয়ার জন্যে দারোয়ান আর অপেক্ষা করল না। বেশ ফিটফাট থাকে দারোয়ান ; খুব হুঁশিয়ার আর চটপটে লোক। দশ হাতে কাজ করে। ঘণ্টা পেটায় কি ! কানে তালা ধরবার উপক্রম আর কি ! কাছে-পিঠের কেন অনেক

দুরের লোকজনও টের পায় দারোয়ান শিউনন্দন ঘড়ি ঘণ্টা পিটছে আর মথুরানাথ বিদ্যাপীঠের ক্লাশ বসছে।

শংকর কেমন আনমনা ছিল। মনটা খুঁত খুঁত করছিল। আজ যদি প্রফুল্লবিকাশবাবু সত্যি না আসেন শেষ পর্যন্ত। হরেনবাবু কি প্রফুল্লবিকাশবাবুর সঙ্গে এখনো কথাবার্তা কিছু বলেন নি? কি জানি, তার ভয় হয় শুধু, দেরি হয়ে যাবে না তো।

শংকর সাত-পাঁচ ভাবছিল। এমনি সময় বীরবিক্রমবাবুকে নাম ডাকার খাতা হাতে ক্লাশের দিকে যেতে দেখে শংকরও তড়িঘড়ি ক'রে ছুটল ক্লাশ রুমের দিকে।

—যাক আগে তো নামটা প্রেজেণ্ট করিয়ে আসুক। এদিকে প্রফুল্লবিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় কিছুতেই ক্লাশে যেতে মন সরছিল না, ওদিকে আবার একটি মিনিট দেরি হয়েছে কি কোনো কৈফিয়ত শুনবেন না বীরবিক্রমবাবু। স্কুলে উপস্থিত থেকেও সে অনুপস্থিত হয়ে যাবে। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা নিয়ে শঙ্কর শেষ পর্যন্ত ক্লাশে গিয়ে বসল। কিন্তু বসলে কি হবে, শঙ্করের মন থেকে দুর্ভাবনা কি যায় নাকি। চারপাশে শত্রুরা যে রকম চোখ উঁচিয়ে আছে তাতে চান্সটা শেষ পর্যন্ত ফসকে না যায়। তিমিরবরণটা তো হরেনবাবু খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজগুবি আর গাঁজাখুরি ব'লে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। আর এখন খবরটা এতদূর গড়াবার পর যখনি বুঝবে এক-টুও উড়িয়ে দবার মতো নয়, আর তারই কথা হরেনবাবু স্যারের মাথায় এমন ঘুরছে, তখন কি আর সে ক্লাশে বসতে পারবে। তিমিরবরণের বাক্যযন্ত্রণায় তাকে না একেবারে স্কুলই ছাড়তে হয়। বন্ধু হয়ে তিমির শেষকালে এমন শত্রুর কাজ করবে

শঙ্কর ভাবতেই পারে না। আর হরেনবাবু তাকে সেদিন ডেকে পাঠাবার পর থেকে তিমির ক্লাশের দু'-চারজনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখিয়ে কি যেন ইশারা করে। আর এতেই শঙ্করের মনে সন্দেহটা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। বীরবিক্রমবাবুর ক্লাশে তাকে এমন তড়িঘড়ি ক'রে ঢুকতে দেখে তিমির যেন মিটমিট ক'রে তার দিকে চেয়ে ঠাট্টা ক'রে হেসে কি বলছে চাপা গলায় বুলুর কানে কানে। সে সোজাসুজি না তাকিয়ে আড়চোখে লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ বাজপড়ার শব্দ যেন কানে গেল তার। বিক্রমবাবু তার রোলনাম্বার ডেকেছেন। শংকর যেন ইলেকট্রিকের শক খেয়ে তড়াক ক'রে বেঞ্চ ছেড়ে শূন্যে খানিকটা লাফিয়ে উঠেছে। ভুল করলেই হয়েছিল আর কি। যেই মাত্র বিক্রমবাবুর মুখ থেকে বেরিয়েছে শব্দগুলো, ফর্টি ওয়ান, শংকর প্রায় শেষ হওয়ার আগেই জানিয়েছে, ইয়েস্যার। না হলে ক্লাশ শেষ হলে বীরবিক্রমবাবুর সঙ্গে সঙ্গে টিচার্স রুম পর্যন্ত যেতে হবে, তারপর সেখানে কৈফিয়ত দিয়ে নাম প্রেজেন্ট করাতে হবে। আর তাও কি কম হাঙ্গামা! বীরবিক্রমবাবুর হাতে পায়ে ধরতে ধরতে আরেক পিরিয়ডের অর্ধেক কাবার হয়ে যাবে। যাক, শংকর বাঁচল। নাম প্রেজেন্ট হয়ে গেছে তো। এখন সে ভাবতে পারে প্রফুল্লবিকাশবাবুর কথা। হরেনবাবু যতই বলুন, প্রফুল্লবিকাশবাবুকে তার কথা বলবেন, সত্যি সত্যি কি প্রফুল্লবিকাশবাবু তার মতে চার-ফুট আট-ইঞ্চি, শংকর ঘোষালের কথা একটিবারও ভেবে মনে রাখবেন।

তাই ক্লাশেই বসেছিল শংকর, কিন্তু মন তার ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করছিল লাইব্রেরী ঘরের আনাচে-কানাচে।

এতক্ষণেও কি প্রফুল্লবিকাশবাবু এসে পড়েন নি?

ফার্স্ট পিরিয়ড শেষ হবার ঘণ্টা পড়তেই শংকর জায়গা ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে।

বীরবিক্রমবাবু ক্লাশ থেকে বেরুবার পর সে তাই একটুও অপেক্ষা করে না। ওর তাড়া করা দেখে অমলশংকর আর তিমিরবরণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে নাকি আবার! কিন্তু সেদিকে নজর রাখার বিন্দুমাত্র সময় আছে কি। সিঁড়ি বেয়ে সে যেন গড়িয়ে নেমে গেল সাঁ ক'রে। ও যখন সব ক'টা ধাপ শেষ ক'রে নিচে নেমে এসেছে তখন বীরবিক্রমবাবু মোটে পাঁচ-সাতটা ধাপ নেমেছেন। সে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েই আবার সামনে ফিরে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে সোজা। আর পড়বি তো পড় একেবারে হেডমাস্টারমশায়ের মুখোমুখি। আশ্চর্য হেডমাস্টারমশাই কেমন প্রসন্ন হয়ে তাকালেন তার দিকে। তবে কি শুধু অমল আর তিমিরই ওকে বাধা দেবার জন্যে আড়ালে জোট পাকাচ্ছে। পাজি ছুঁচো তিমিরবরণটার কথা ভেবে শংকরের মনটা যেমন রাগে জ্বলে গেল, তেমনি দুঃখে ভ'রে গেল অমলশংকরের কথা ভেবে। তিমিরটার দলে প'ড়ে তুইও শেষকালে আমার শত্রু হয়ে দাঁড়ালি? ভেবে-ছিলুম তোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা পরামর্শ করব। কিন্তু আজকাল তিমিরই তোর বড় বন্ধু হয়েছে! শংকরের মনটা এই সব ভাবতে ভাবতে অভিমানে ভ'রে গেল।

যাই হোক সামলে নিল নিজেকে। দারোয়ান শিউনন্দন একেবারে তার চোখের সামনে—প্রফুল্লবাবু আয়া? তার জিজ্ঞাসার ধরনে মনে হল সারাক্ষণ ব'সে সে ক্লাশে এ কথাটাই আওড়াচ্ছিল। কখন গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে দারোয়ানকে

কথাটা। শিউনন্দন ওর ব্যস্ততা দেখে বুঝতে পারে শংকরের মনের দুর্ভাবনা। যেন সে জিজ্ঞাসা করবার আগেই দারোয়ান নিজেই তৈরী ছিল তাকে খবরটা দেওয়ার জন্যে।

—হাঁ হাঁ, প্রফুল্লবাবু তো আসে গেছেন, শিউনন্দন ওকে ভরসা দিয়ে বলে।

আর একটুও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে না সে। খবরটা পাওয়া মাত্র ভোঁ দৌড় লাইব্রেরী ঘরের দিকে। তার যে ভীষণ দরকার কিছু একটা প্রফুল্লবিকাশবাবুর সঙ্গে তা বোঝা যায়। কিন্তু কি দরকার তা অনুমানও করতে পারে না শিউনন্দন। শুধু তার দৌড় দেওয়ার ঢঙে মুচকি হেসে খইনি টেপে।

লাইব্রেরী ঘরের সামনে গিয়ে শংকর একবার উঁকি মারে। ওইতো প্রফুল্লবিকাশবাবু আরাম-কেদারায় শুয়ে। আবার এখন কে এল দরকারি কথা নিয়ে। যদি বা প্রফুল্লবাবুকে পেল, তো একা নয়। কেউ কি শংকরকে একটু সুযোগ দেবে না। হরেনবাবুর মুখ থেকে খবরটা পাওয়ার পর থেকেই সে দেখছে তার প্রাণের বন্ধুরাও সব বিগড়ে গেছে। না হলে অমলের মতো অমন ছেলেও তিমিরবরণের সঙ্গে জোট পাকায়।

যাক বাঁচা গেল। লোকটা দু'হাত মাথায় তুলে নমস্কার জানাচ্ছে প্রফুল্লবিকাশবাবুকে। এবার বিদায় নেবে। প্রফুল্লবাবুও মাথা নেড়ে রাজী হওয়ার মতো কি বললেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল শংকর। এইবার তার বুক টিপটিপ করতে লাগল। মনে মনে যে আনন্দ হচ্ছে না তাও নয়, তবু কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। প্রফুল্লবিকাশবাবুর কাছে কথাটা পাড়তেই যদি ফস ক'রে কিছু ব'লে বসেন তিনি চটে উঠে।

লোকটা যদিও সরল শংকরের পা আর সরতে চায় না।

শেষকালে এক এক ক'রে যত বড় বড় ফুটবল খেলোয়াড় আছে, তাঁদের নাম করতে করতে শংকর ঢুকে পড়ল লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে। খেলার মাঠে সাহস আনবার জন্যে এঁদেরই নাম শংকর বরাবর জপ ক'রে এসেছে। এখন প্রফুল্ল-বিকাশবাবুর সামনে নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে যেই মনে হল অমনি সেই সব নামগুলো তার জিবের ডগায় একটি একটি ক'রে এসে গেল, আর শংকরও সাহস পেল কোথা থেকে।

মাথা চুলকিয়ে প্রফুল্লবিকাশবাবুর পিছনে এসে কোনো রকমে পায়ের ওপর জোর রেখে শংকর যা থাকে বরাতে ভেবে শুরু করে দেয়। স্যার, হরেনবাবু আপনাকে, আমার···

শুধু এইটুকু মাত্র বলেছে, প্রফুল্লবিকাশবাবু তার দিকে ঘাড় ফিরিয়েছেন।

—শংকর, তুই। হ্যাঁ, তোর কথাই আমাকে বলছিলেন বটে হরেনবাবু, এমন শান্ত খোসমেজাজে তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন প্রফুল্লবিকাশবাবু; হেডমাস্টার আর সেক্রেটারী পর্যন্ত যে প্রফুল্লবাবুকে সমীহ ক'রে চলেন, পরামর্শ চান, সেই বাঘের মতো ভয়ংকর তিনি স্বয়ং চার-ফুট আট-ইঞ্চি শংকর ঘোষালের সঙ্গে এমন মোলায়েম গলায় কথা বলছেন। এ-কথাটা তিমিরবরণকে বললে, সে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করবে তাকে? তার মনে মনে গলা ছেড়ে হাঁক দিতে ইচ্ছে করল, দেখে যারে তিমির দেখে যা। নিজের চোখে না দেখলে তো বিশ্বাস করবি না তোরা।

—এই ছাখ, তোর জন্যে বইও বেছে এনেছি খানকয়েক

প্রফুল্লবাবু ওঁর ডান দিকের কয়েকখানা মোটা মোটা বই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

শংকরের হঠাৎ মনে হল বইগুলো ওইখানেই ছিল তবু তার চোখেই পড়ে নি। আর বইগুলো তারই জন্যে আনা হয়েছে! শংকরের যেমন গর্বে বুক ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, খুশিতে মনটা টলমল করতে লাগল, তেমনি আবার ভয়-ভাবনায় দুরদুর করতে লাগল। কি সর্বনাশ! ওই মোটা মোটা বইগুলো তাকে শেষ করতে হবে। তাও আবার বাংলা নয়। এমন সব ভাষা যার একটি বর্ণও সে চেনে না। জ্যামিতির বইখানা খুললেই তার মাথা ঘুরে যায়। আর পাঁচখানা জ্যামিতি বই নিয়ে এক একখানা বই।

—স্যার? মাথা চুলকিয়ে শংকর ওইটুকু ব'লেই চুপ ক'রে থাকে। যেন প্রফুল্লবিকাশবাবু বুঝে নেবেন কি কথা সে জিজ্ঞাসা করতে পারে।

—কি? এমন অভয় দিয়ে বললেন তিনি, যেন—থামলি কেন?

—স্যার, ওই বইগুলো সব পড়তে হবে? শংকর সাহস এনে ব'লেই ফেলল।

—আরে, না না, হেসে বললেন তিনি। তার মুখ দেখে তিনি আরও বুঝলেন সে ভরসা পেয়েছে। সব পড়তে হবে কেন? বেছে বেছে পাঁচ-দশটা কথা মুখস্থ ক'রে মনে রাখতে হবে। খানিকটা প'ড়ে যাব, ভাল ক'রে কান পেতে শুনে উচ্চারণ বুঝে, তোকে বলতে হবে কোন ভাষায় লেখা, ফের বললেন প্রফুল্লবিকাশবাবু কথাটা পরিষ্কার ক'রে বোঝাবার জন্যে।

—কি? তা হলে আরম্ভ ক'রে দে।

—আজ থেকেই স্যার? শংকরের যেন কিছুতেই ভরসা নেই যত হালকাই বলুন না কেন প্রফুল্লবাবু।

—তবে কবে থেকে?

—কাল থেকে স্যার, তার আমতা আমতা ক'রে বলার ঢঙে প্রফুল্লবিকাশবাবুর মতো লোকও হেসে ফেলেন।

—দেখিস, তৈরী ক'রে নেবার আবার সময় থাকবে তো? এই সামান্য ক'টা কথায় শংকর ধরতে পারে হরেনবাবুর সঙ্গে তার বিষয়ে সব কথাই হয়েছে তাঁর।

—না স্যার, কাল থেকে ঠিক হয়ে যাবে, খুব জোর দিয়ে বলে শংকর।

—বেশ। তবে কাল থেকে ছুটির পর লাইব্রেরী ঘরে চ'লে আসবি সোজা।

—না স্যার। এখানে এলে ছেলেরা উঁকি মারবে। তিমিরবরণটা ভীষণ পাজি স্যার। অমলটাও কম ফাজিল নয়। সব এখানে এসে ভিড় জমাবে।

কথাগুলো ব'লে শংকর তাকিয়ে থাকে প্রফুল্লবিকাশবাবুর দিকে। কি বলেন তিনি শংকর শুনতে চায়।

—থাক তবে এখানে। কোথায় পড়বি? শংকরের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি এমন ভাবে বলেন যে মনে হয়, বল তোর কোথায় সুবিধে হবে তবে।

—আপনার বাড়িতে ছুটির পর গেলে হয় না স্যার? আর একটুও দেরি না ক'রে সে ব'লে ফেলেছে।

—বেশ। সুবিধে হলে তাই আয়। এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন প্রফুল্লবিকাশবাবু।

যাক বাঁচল শংকর। অন্তত তিমিরবরণ আর অমল-

শংকরের হাত থেকে ও বাঁচল। লাইব্রেরী ঘরে ব'সে পড়লে রক্ষে ছিল নাকি। ওদের উঁকি-ঝুঁকি আর ঠাট্টা-তামাশার ঠেলায় কাজ এগুবে বটে। যাক এখন ভালয় ভালয় এই ব্যাপারটা চুকে গেলে বাঁচা যায়। লোকটা চোদ্দটা ভাষায় গান গায় শুনে আগে যেমন তার হাসি পেয়েছিল, এখন প্রফুল্লবিকাশবাবুর মোটা মোটা বইগুলোর কথা মনে ভেবে লোকটা সম্বন্ধে কেমন শ্রদ্ধাভক্তির ভাব এল। অতগুলো ভাষা, তাতে আবার সুর।

পরের দিন স্কুলের ছুটির পর অমল আর তিমির দু'জনে শংকরকে ধরেছে। তিমির বলল, কি রে, আজ সেভ্‌ন বুলেট্‌স-এর সঙ্গে জোর খেলা। মাঠে যাবি না?

খুব ঘাবড়ে যায় সে। কি বলবে এখন। প্রফুল্লবিকাশ-বাবুর বাড়িতে আজ প্রথম যাচ্ছে। আর আজই যদি না যায় তো তিনি আর ছেড়ে কথা কইবেন না। হরেনবাবুর কানে কথাটা নিশ্চয় তুলবেন। আর হরেনবাবু যখন জানতে পারবেন তার নিজের চাড় নেই, তখন এ-ব্যাপারে সব কিছু চাপা প'ড়ে যাবে। না, শংকর এতখানি তোড়জোড় ক'রে শেষ পর্যন্ত একটা গেমের জন্যে সব কিছু ভণ্ডুল হতে দেবে না।

—না রে। বাবা একেবারে ভীষণ রেগে আছে। মাকে বলেছে, এবার অঙ্ক আর সংস্কৃতয় পাশ না করতে পারলে এখান থেকে সেই জব্বলপুরে পাঠিয়ে দেবে বড়মামার কাছে।

কথাগুলো ব'লে শংকর খুব করুণ চোখে চাইল দুই বন্ধুর দিকে। ভাবখানা যেন, তোরা ভাই সব কিছু ভেবে চিন্তে দেখে আমাকে ছেড়ে দে।

অমল আর তিমির তার কথা শুনে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কাল তাকে লাইব্রেরী ঘরে প্রফুল্লবিকাশবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করতে দেখে সন্দেহ করেছে ওরা দু'জনে। শংকরের বুক কাঁপতে থাকে দুর্ভাবনায়। এই রে, এবার বুঝি জেরা শুরু করবে দু'জনে মিলে। কোনো রকমে ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

—জব্‌ব্‌ল্‌পুর, সে তো অনেক দূ-র। তিমিরবরণ কথাগুলো ব'লে এমন ভাবে তাকালো অমলশংকরের দিকে, যে তার মনে মনে হল, ছেড়ে দে ভাই শংকরকে। শেষকালে যদি সত্যি-সত্যি জব্বলপুর চ'লে যায় তো আর দেখতে হবে না। তখন বাড়ি গিয়ে ডাকাডাকি সাধাসাধি করলেও আর শংকরের টিকি-টি মিলবে না।

অমল বুঝি তিমিরের মনের কথাটা ধরতে পারে, তাই একটু আকুতি ক'রে বলে, আচ্ছা, এ গেমটা আমরা ম্যানেজ ক'রে নেব। তোকে কিন্তু গ্রেট এঞ্জেল্‌সদের সঙ্গে খেলতে হবে। ওদের তিন জন প্লেয়ার বুট প'রে খেলে। আমাদের তুই ছাড়া তো বুট-পরা প্লেয়ার আর একজনও নেই। তোকে খেলতেই হবে।

শংকর জোর মাথা নেড়ে জানালো সে নিশ্চয় খেলবে। গ্রেট এঞ্জেল্‌সদের সঙ্গে না খেলতে পারলে তারও কম দুঃখ নাকি, সে কথাও শংকর জানিয়ে দিল।

যা হোক আপতত খুশি হল ওরা দু'জন। শংকরকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না তারা—কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, এই সব কথা আবার। শংকরের তো পালাই-পালাই করছে মন। আর একটি মুহূর্ত দেরি না-ক'রে সে নিজের পথ ধরল।

পথে যেতে যেতে শংকর ভাবছিল, প্রফুল্লবিকাশবাবু হয়তো এতক্ষণ বইপত্তর খুলে তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছেন। প্রথমদিনই তার এ-রকম লেট দেখে হয়তো হরেনবাবুকে বল-বেন, কিস্সু হবে না ওকে দিয়ে মশাই। কোনো চাড় নেই।

এমনি ক'রেই খারাপ ছেলেদের সম্বন্ধে প্রফুল্লবাবু বলেন, সে শুনেছে। চটপট শংকর পা চালালো।

ঘামতে ঘামতে শংকর পৌঁছল যখন প্রফুল্লবিকাশবাবুর বাড়ি তখন দেখল সে যা ভেবেছে তাই ঠিক। প্রফুল্লবাবুর বাড়ির ঢোকবার মুখেই যে ঘরখানা তার দরজা হাঁ-ক'রে খোলা, আর সেই খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে দেয়ালঘড়ি তার চোখে পড়ল। আরো! সে যে প্রায় বিশ মিনিট লেট ক'রে ফেলেছে। ওই তো প্রফুল্লবাবু বইপত্তর খুলে তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছেন। অমল আর তিমিরটাকে তার ঘুঁষি লাগাতে ইচ্ছে করল। কোনো ভাল কাজের সময় পথে ওদের সঙ্গে দেখা হলে আর কি রক্ষে আছে! সব ভণ্ডুল ক'রে দেবে ও দু'টোয়।

ভয়ে ভয়ে শংকর তাঁর পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ালো। গলা নামিয়ে খুব আস্তে বলল, স্যার আমি এসে গেছি।

ঘাড় ফেরালেন তিনি। তারপর হেসে বললেন, এসে গেছিস। আয়, বোস। আমি ভাবছি দেরি হচ্ছে কেন তোর।

—হ্যাঁ স্যার, বড্ড দেরি হয়ে গেল, শংকর ক্ষমা চাওয়ার মতো ক'রে বলে।

—না, খুব একটা দেরি হয় নি, প্রফুল্লবাবু তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকান।

শংকর চোখ তুলে একবার দেয়ালঘড়ির দিকে তাকায়।

তাকে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে প্রফুল্লবিকাশবাবু আবার একটু হাসলেন, বললেন, ও ঘড়িটা দেখছিস ! ওটা খু-ব ফাস্‌ট যাচ্ছে ।

আশ্চর্য ঘড়িটাও শংকরের বন্ধু ! এই ঘড়ির সময় দেখেই শংকর ঘাবড়ে গিয়েছিল তবে । এখন দেখছে সবাই তার বন্ধু, শুধু তিমিরবরণ আর অমলশংকর ছাড়া ।

প্রফুল্লবিকাশবাবুর মতো লোক তার একটা উপকারের জন্যে এমন গম্ভীর ভাবে চিন্তা করছেন, এ কথা মনে ভেবে দেখতেই শংকর বার বার গর্ব অনুভব করতে লাগল । এখন সে যদি মন না দেয় তো প্রফুল্লবিকাশবাবুর কোনো দোষ নেই । আর হরেনবাবুরই বা কি করবার আছে । তিনি তো গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই করছেন তার জন্যে । কোথায় লোকটা চোদ্দটা ভাষায় গান গায় তার জন্যে প্রফুল্লবাবুকে ব'লে রাখা, আবার তারই জন্যে কাউন্সিলার প্রজ্ঞানারায়ণবাবুকে ধ'রে মেয়রকে ধরা-কওয়া । আর কি করতে পারেন তিনি । সত্যি শংকর গল্পে ঠিকই পড়েছে বিপদে পড়লে মানুষ চেনা যায় । আজ সে বুঝতে পেরেছে হরেনবাবু স্যার কত মহৎ লোক । সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার জ্ঞানের কথা ভেবে শংকরের মনে যে শ্রদ্ধা জেগেছিল, হরেনবাবুর সহানুভূতির কথা ভেবে তার মনে ঠিক সেই রকম ভাবই জাগল । শংকর মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে বসল হঠাৎ । যেমন ক'রে বেড়িয়ে বেড়িয়ে পায়-চারি ক'রে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ মুখস্থ করে, তেমনি মুখস্থ করবে প্রফুল্লবিকাশবাবু যা বলবেন । একদিন এমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পায়চারি ক'রে পদ্য মুখস্থ করছিল শংকর, যে ঘরের মধ্যে পা-দিয়েই তার ছোটমামা বলেছেন, অর্থাৎ বলতে

প্রায় বাধ্য হয়েছেন, কি রে! তুই যে দেখছি আমাকেই আক্রমণ করবি।

শংকর কিছুমাত্র কর্ণপাত করে নি ছোটমামার কথায়। শুধু বাধা পেয়ে বলেছে, এখন ডিস্টার্ব করো না ছোটমামা। এবার এ কোশ্চেনটা এসে গেছে।

শংকরের মা'র কানে কথাটা গেছে। তিনি হেসে ফেলেছেন ভায়ের কথায়। বলেছেন ধমকে—শোন আগে তোর ছোটমামার কথা। তারপর পড়া মুখস্থ করবি। পড়া তৈরী নয় তো, যেন ফুটবল খেলছে। নিচের ঘরে রয়েছি মনে হচ্ছে মাথার ওপর ছাত পিটছে।

শংকর ছোটমামাকে চ্যালেঞ্জ করল, যখন তার ছোটমামা বললেন কোশ্চেনটা নাও আসতে পারে। কোশ্চেনটা ইতিহাসের পরীক্ষায় সত্যি এল। আর শংকরও বাজি জিতল।

সে মনে মনে প্রার্থনা করল, হে ভগবান, প্রফুল্লবিকাশবাবুর কাছে সে যা শিখছে তা যেন শেষ পর্যন্ত কাজে লাগে। এবারে আর ছোটমামা নয়, অমল আর তিমিরকে সে চ্যালেঞ্জ করবে। আর যদি তার মুখ রক্ষে না হয়? কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে অমলশংকর আর তিমিরবরণের হাসি-হাসি ফাজিল মুখ দু'টো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওরা দু'টোয় যেন শংকরের পরাজয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে।

আর এই কথা ভাবতে ভাবতে শংকরের মনে জেদ চেপে বসল। যেমন ক'রেই হোক লোকটাকে নামিয়ে আনতেই হবে। আর তার জন্যে যা করা দরকার শংকর সব কিছু করবে। আজ থেকেই শংকর প্রফুল্লবিকাশবাবুর কথা মতো চলবে। হরেনবাবুর সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ ক'রে তাঁর উপদেশ

মেনে চলবে। হরেনবাবুকে নিয়ে তাদের ক্লাশের বুলুর দাদা অনেকদিন আগে যে ছড়াটা বেঁধেছিল সেটার কথা মনে পড়তেই তার মনে হল সে কত অকৃতজ্ঞ। বুলুর দাদা লিখেছিল :

বসতে পেলেই ঘুমিয়ে পড়েন
একটু কি ছাই নড়েন চড়েন!
সংস্কৃতয় ঝগড়া করেন
ইঁদুরকে ভাই বড়ই ডরেন

আর স্কুলের যত ফাজিল ছেলেরা সব মুখস্থ করেছিল ছড়াটা। এই হরেনবাবু না থাকলে এত বড় একটা সুযোগ আসত নাকি তার কাছে। সে মনে মনে আরো একবার ক্ষমা চেয়ে নিল হরেনবাবুর কাছে।

আবার ভাবতে ভারতে তার মনে পড়ল। অনুশোচনায় তার মনটা ভ'রে গেল। তিমির বুলুকে বলেছে, হরেনবাবু স্যার তার নাম নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। বুলু যেন তাদের অপমান লজ্জার কথা তার দাদাকে জানায়। কারণ সবাই জানে, বুলুর দাদা যিনি কলেজে পড়েন, সিগারেট খান, কি একটা কাগজের সম্পাদক, তিনিই পারেন এই অপমানের উত্তর দিতে।

বুলুর কাছ থেকে সব শুনে তিনি বলেছেন, সত্যিই তো এটা খুব অন্যায়। নামের ওপর তো কারো হাত নেই। কেন হরেনবাবুর নাম অত ছোট্ট আর তাঁদের সহকর্মী প্রফুল্লবিকাশ-বাবুর অত বড় নাম। হরেনবাবু তার বেলায় কিছু বলতে পারেন না? যেহেতু তিনি পণ্ডিত লোক। ঠিক আছে। ব'লেই খসখস ক'রে বুলুর দাদা লিখে ফেলেছেন :

প্রফুল্লর ফুল্ল ছাড়া, বিকাশের বি,
বাকি যাহা পড়ে থাকে তাতে ক্ষতি কি?

অর্থাৎ অত বড় প্রফুল্লবিকাশবাবুর বদলে শুধু প্রকাশ নামে দোষ কি। এ ছড়াটাও ছেলেরা চালু করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রফুল্লবাবুর চেহারা হাব-ভাব দেখে বেশি দূর এগোতে সাহস পায় নি।

এই তো চোখের সামনে সোজাসুজি ব'সে আছেন প্রফুল্ল-বিকাশবাবু। তাঁর দিকে তাকিয়ে শংকর মনে মনে গদগদ হয়ে বলল, স্যার আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। বুলুটার কান ভাংচি দিয়েছে তিমির। বুলুটার পেটে কোনো কথা থাকে না। ঝগড়ার গন্ধ পেলে একবার হয়! দাদার কানে গিয়ে কথাটা তুলেছে। আর বেজায় চালিয়াৎ বুলুর দাদা। আমায় আপনি ক্ষমা করুন স্যার।

প্রফুল্লবাবু নেহাৎই সামনে ব'সে আছেন তাই। না হলে শংকর হয়তো নিজের তু'টো কানেই হাত দিত কানমলার মতো ক'রে।

তাই জীবনে ও যা করে নি আজ তাই করবে ব'লে জেদ ধ'রে বসল। বই নিয়ে কোথাও একসঙ্গে একঘণ্টা সে কখন বসতে পারে নি। শংকরের মা অনেক চেষ্টা-চরিত্র ক'রেও কিছুতে শংকরকে একটি ঘণ্টাও পড়ার ঘরে আটকে রাখতে পারেন নি। শংকরের বাবাকে এ নিয়ে কম কিছু বলছেন নাকি। শংকরের বাবা বলেছেন, ভাল কথা। এবার থেকে চোখের সামনে বসিয়ে রেখে পড়াবো। কি ক'রে ফাঁকি দেয় দেখি।

শংকরের বাবা শংকরের মাকে বললেন, ঠিক আছে। রবিবারটাই তো আমার একটু দম ফেলার সময়, ওদিনটাও না-হয় বেরবো না। শংকর, সামনের রবিবার আমাকে মনে করিয়ে দিবি। কি করছিস, না করছিস একবার দেখব।

শংকর যেন কত ভাল ক'রে মনে রাখবে কথাটা এমন ভাবে মাথা নেড়েছে। সে জানে রবিবার বাবা বাড়ি থেকে বেরুবে না এই পন করছে বটে, তবু কি বাবা না বেরিয়ে থাকতে পারবে। ব্রিজ খেলার ক্লাবে গিয়ে সে দেখেছে বাবাকে ; হীরালালবাবু, সতীশবাবু, করুণাবাবু, জগন্নাথবাবু কি ভীষণ রেগে গেছেন। কোথায় খেলায় কার কি একটু ভুল হয়েছে, ব্যাস, আর রক্ষে নেই। বেঁধে গেল তুমুল গণ্ডগোল। মাঝে মাঝে বাজখাঁই গলায় এমন চিৎকার ক'রে ওঠেন জগন্নাথবাবু যে ঠিক মনে হবে বুঝি হাতাহাতি শুরু হল। খেলার শেষেও চলবে এক ঘণ্টা ধ'রে খেলার আলোচনা। কোথায় কোন ভুলটা না হ'লে খেলা কোন দিকে ঘুরে যেত তার ছক কেটে দেন হীরালালবাবু। তুখোড় খেলোয়াড় নাকি হীরালালবাবু। বাবা হীরালালবাবুর জুড়ি। মাঝে মাঝে ভীষণ ধমক দিয়েছেন তিনি শংকরের বাবাকে। কোথায় কি একটা ভুল ক'রে বসেছে। আর তাইতেই সমস্তটা খেলা নাকি মাটি হয়ে গেছে। তবু বাবার খেলার খুব প্রশংসা করেছেন হীরালালবাবু। বাবা যদি না খেলে তো ক্ষেপে যাবেন তিনি। এই সামনেই ব্রিজ কম-পিটিশন। বাবা ক্লাবে না গিয়ে বাড়ি ব'সে তাকে পাহারা দিচ্ছে, এ কথা শুনলে হীরালালবাবুর মাথার ঠিক থাকবে আর !

তাই শংকর মনে মনে মতলব আঁটল, কোনোক্রমে কথাটা একবার হীরালালবাবুর কানে তুলতে পারলে হয়। বাবাকে ছাড়া তিনি খেলবেন কি ক'রে। ঠিক মতো জুড়ি না পেলে ব্রিজ কম্পিটিশনে খেলা চলে। সাধে কি অমল আর তিমির তাকে অনুরোধ করেছে সেভেন বুলেট্‌স-এর সঙ্গে খেলবার জন্যে। তার মতো একটা খেলোয়াড়ের অভাবে সমস্ত

গেমটাই হয়তো মাটি হয়ে যাবে। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি, এটা আর কি এমন কঠিন কাজ! শংকর মনে মনে ভাবল।

হীরালালবাবুর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে কোনো রকমে যদি খবরটা তাঁর কানে তোলা যায় দুঃখ ক'রে তা হ'লে আর দেখতে হবে না। দলের মধ্যে বয়সে তিনিই সব চেয়ে বড়। তাই দলের সবাইকার বন্ধু হয়েও তিনি যথার্থ দাদা। মাথার বেশ কিছু চুলে পাক ধরেছে। দেখলেই মনে হয় খুব হুঁশিয়ার আর সজাগ। খেলা বুঝতে আর বোঝাতে তাঁর মতো সত্যি আর কেউ নেই। বহুবার ব্রিজ কম্পিটিশনে বড় বড কাপ পেয়েছেন তিনি। তাঁর কানে কথাটা চুপি চুপি একবার তুলতে পারলেই হয়। বাবাকে কী বলেন তিনি, বুঝবে বাবা। ভোরবেলা তাদের বাড়ির কাছেই যে পার্কটা আছে, সেই পার্কে গোল হয়ে ঘুরে কয়েকটা পাক দেবেন তিনি। এখনও স্বাস্থ্য জোয়ান ছেলে-ছোকরার মতো। পার্কে এই রকম ঘোরার অভ্যেস যে তাঁর কতকালের তা সে কেন, তার বাবাও ঠিক মতো বলতে পারবে কিনা সে জানে না।

তাই পার্কেই গেল শংকর। হীরালালবাবু ঠিক ঘুরছেন। এখনো সূর্য উঠতে অনেক দেরি। বেশি লোক নেই পার্কে। হীরালালবাবু চট ক'রে চোখে প'ড়ে গেলেন শংকরের। পাতলা একটা চাদর গায়ের ওপর ছড়িয়ে রেখেছেন। হাতে হালকা একটা ছড়ি। শংকর তাঁর উল্টোদিক থেকে ঘুরতে লাগল। মানে, একটা জায়গায় এসে মুখোমুখি দেখা হবে দু'জনের।

দু'টো তিনটে পাকের মধ্যেই কাজটা সেরে ফেলবে শংকর। কিন্তু যা ভাবা যায় তাই কি হয় নাকি। দু'টো পাক দেওয়া শেষ হল তবু তো কই হীরালালবাবু তার দিকে চোখ নামালেন

না। একেই ভীষণ লম্বা তিনি, তারপর ঘাড় সোজা রেখে চোখ উঁচু ক'রে হাঁটেন। কাজেই শংকর তাঁর চোখেই পড়ল না।

এইবার তার শেষ পাক। কতক্ষণ ঘুরবেন হীরালালবাবু, ক'টা পাক দেবেন কে জানে। তাই সে একটা প্ল্যান ঠিক ক'রে ফেলল। একটু রাগ ক'রেই সে এমন একটা মতলব ভাঁজল। তিন নম্বর পাক দেওয়ার মাথায় সে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এমন আনাড়ির মতো এসে পড়ল হীরালালবাবুর পথের সামনে যে তাঁর পায়ে পায়ে জড়িয়ে গেল প্রায়। চোখ নামালেন তিনি। মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছে এরই মধ্যে। কিন্তু চোখাচোখি হতে যেই দেখলেন শংকর তখন কোথা থেকে গোল বড় মুখটা একটু একটু ক'রে হাসিতে ভ'রে গেল। শংকরের মাথাটা তাঁর কোমর-পেট ছাড়িয়ে একটু ওপরে যায়। তিনি সেখানেই তার মাথাটা চেপে ধরলেন সস্নেহে। বললেন, বাবা কি এখনো বিছানায়? জোর ক'রে হ্যাচকা টানে তুলে আনতে পারিস না?

শংকর লজ্জা পেল। বাবাটা বড় কুঁড়ে। কেন, একটু সকাল সকাল উঠে তাকে যা দরকার পড়াশুনার ব্যাপারে তা দেখিয়ে দিতে পারে না। শুধু শুধু রবিবারটা আটকে রেখে দেবে। আর এখন কি তার বাড়িতে ব'সে থাকবার একটু সময় আছে। কখন কোন খবরটা হরেনবাবুকে দিয়ে আসতে হবে, বা নতুন কোন খবর আছে কিনা তার খোঁজ নিয়ে আসবে, এই রকম অনেক কাজ।

সুযোগ মিলেছে শংকরের। সে চটপট ব'লে ফেলল, না জ্যাঠাবাবু। বাবা ভোরে উঠবে কি ক'রে বলুন। আমাকে

যে আজকাল রাত্তিরে রোজ পড়ায় কিনা। এই দেখুন না, রোববারেও বাড়ি থেকে বেরুতে বারণ করেছে। মাকে বলেছে, আমাকে পড়াবে নিয়ম ক'রে।

তার কথাটা শেষ হতেই হীরালালবাবুর মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল। মুখ দেখে মনে হল শংকরের কথায় কি যেন ভাবলেন তিনি একটু। তারপর বললেন, কেন তোর জন্যে একটা মাস্টার রাখতে পারে না তোর বাবা। দাঁড়া আমি দেখছি। এদিকে খেলার সময় যত এগিয়ে আসছে তোর বাবারও তত কাজ পড়ল এ সময়টা। তোর বাবাই আমাকে শেষ পর্যন্ত ডোবাবে দেখছি!

—কেন জ্যাঠাবাবু, বাবা কি খেলবে না বলছে, শংকরের যেন কত দুর্ভাবনা, এমনি ক'রে বলল মুখ কাচুমাচু ক'রে।

—কই! তুই যা বললি তাতে তো লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না, হীরালালবাবু যেন সত্যিই দুর্ভাবনায় পড়েছেন।

—আপনি বললে কি আর বাবা খেলবে না জ্যাঠাবাবু। আর এমন দরকারি খেলা—

আমারও তো ভাবনা তাই। দাঁড়া আমি দেখছি, হীরালালবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে, কি ভাবতে ভাবতে আবার সামনের দিকে চলতে শুরু করলেন। শংকরেরও তিন পাক শেষ হল। সে মনে মনে খুশি হল, যাক এইবার বাবার সঙ্গে হীরালালবাবুর একচোট লাগবে। সে তো এই মজাটাই চাইছিল। এখন কি তার রবিবারেও বাড়িতে ব'সে থাকবার সময় আছে না কি।

শংকর চুপটি ক'রে রইল। কিচ্ছুটি জানালো না বাবাকে।

বাবার হাবভাব দেখেই শংকর বুঝল অনেকখানি মিলছে। রবিবার আসতে এখনো দেরি আছে। শংকর লক্ষ্য ক'রে

দেখতে লাগল বাবাকে। কোথায় যেন বাবা কি একটা শুনে মনে মনে ভাবছে তারই কথা। বাবাকে কিছু একটা চিন্তায় ফেলেছে তবে।

রবিবার সকালবেলা চা খাবার সময় শংকর মার সামনেই বলল, বাবা আজ কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ো না। বিকেল-বেলা বসব আর সেই সন্ধ্যেবেলা উঠব, অনেকক্ষণ পড়ব।

কপাল ঠুকে ব'লেই ফেলল কথাটা সে। দেখাই যাক না কি হয়!

ও মা, বাবার মুখ অমন হয়ে গেল কেন? উত্তর দিল না বাবা কথার। শুধু গরম চা শব্দ ক'রে ক'রে খেতে লাগল।

শংকরও চুপচাপ রইল। বুঝতে পারল যা আন্দাজ করেছে সেই রকম কিছু একটা হবে। খাওয়া-দাওয়ার পর ভদ্রলোক একটু গড়িয়ে নেবেন ব'লে শুয়েছেন এমনি সময় শংকর বাবার পা ছু'টোয় নাড়া দিয়ে বলে, বাবা জ্যাঠাবাবুদের লোকটা এসেছে। তোমায় ওঁদের বাড়িতে যেতে বলেছেন জ্যাঠাবাবু।

আর কি ঘুম থাকে। শংকরের বাবা ধড়মড় ক'রে উঠে বসেছেন। তারপর বলেছেন, না ঘুমোনো আর হল না। আচ্ছা তুই বই-টই নিয়ে বোস, আমি এখুনি ঘুরে আসছি।

শংকরও রেডি হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়ার জন্যে। বলল, হ্যাঁ বাবা, তুমি দেরি করো না। আজ আর বাড়ি থেকে বেরুব না।

তার মনে হল বাবা খুশি হয়েছে তার কথায়। আর মনে মনে ভাবল, বাবা রাত দশটার আগে ফিরছে বটে। হীরালাল-বাবুকে আজ থেকে সে আরো ভক্তি করতে আরম্ভ করল।

যাক বাবা বেরিয়ে যাবার পরই এক ফাঁকে হরেনবাবুর

বাড়িতে গিয়ে একটা খবর দিয়ে আসতে হবে। আর সেই সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার নতুন কোনো খবর আছে কিনা তাও জেনে আসতে হবে।

বাবা বেরিয়ে যাবার পর মা-র চোখে ধুলো দিতে শংকরের বেশিক্ষণ লাগে না। টুপ ক'রে তাই এক সময় শংকর মা-র নজর এড়িয়ে বাড়ির বাইরে পা ফেলল। শংকরের মাকে তখন তার ছোট বোন মিণ্টু বোঝাচ্ছে পুজোর সময় এবারে সে নতুন ধরনের একটা ফ্রক নেবে। শংকরের মা বলছেন, হবে বাবা হবে। বলেছি তো কিনে দেব।

শংকর জানে মা যত ভাল ক'রেই বোঝাক না কেন, মিঠুর বায়না যে কি জিনিস, একবার ধরলে মিঠু চট ক'রে ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। শংকরও বুঝল এই সুযোগ।

পা-চালিয়ে শংকর একেবারে হরেনবাবুর বাড়ির দোর গোড়ায় এসে পৌঁছে গেল। দেখে বাড়ি দরজার সামনেই এক-খানা মস্ত মোটরগাড়ি থেমে আছে। সে একবার ভাবল ভিতরে ঢুকবে কিনা। তারপর সাত পাঁচ ভেবে ঢুকেই পড়ল।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই মহা মুশকিলে পড়ল। দেখল একঘর লোকের মাঝখানে হরেনবাবু সিল্কের লুঙি প'রে ব'সে সিগারেট খাচ্ছেন। দরজার মুখে সে দাঁড়াতেই হরেনবাবু স্যারের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। তার মনে হল এ সময়ে হঠাৎ এসে না-পড়লেই ভাল হত। কিন্তু তাকে দেখা মাত্র সোজা হয়ে উঠে বসলেন তিনি। যেন তারই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ। মুখে খুশির ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর। তিনি বললেন, আয়, আয় ভেতরে আয়।

সে ঘরের ভিতর ঢুকে হরেনবাবুর পিছনে চেয়ার ধ'রে

দাঁড়ালো। পিছন দিক থেকে এক হাত বাড়িয়ে তিনি শংকরের পিঠে রাখলেন। তারপর ঘরের মধ্যে একজন খুব মোটা সোটা টাকমাথা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই যে প্রজ্ঞাদা, এর কথাই বলছিলুম আপনাকে। এই আমাদের শংকর, শংকর ঘোষাল।

—ও—আ—চ্ছা, ব'লে সেই ভদ্রলোক শংকরের দিকে চেয়ে সস্নেহে হাসলেন।

শংকর বুঝল এই তবে সেই কাউন্সিলার প্রজ্ঞানারায়ণবাবু। এতক্ষণে ভাল ক'রে শংকর একবার প্রজ্ঞানারায়ণবাবুকে দেখে নিল। সত্যিই কাউন্সিলারের মতো চেহারা বটে। যেমনি বড় গাড়ি তেমনি বড় চেহারা। সিল্কের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম, ঝকঝকে ঘড়ি, আংটি, চক্‌চকে জুতো, ঝকমকে চশমা, আর তার ওপরে টকটকে রঙ। প্রজ্ঞানারায়ণবাবুকে দেখে শংকরের মনে সত্যি সত্যি একটা শ্রদ্ধাভক্তির ভাব জাগল। শংকর আরও ভাবল, কাউন্সিলারের যদি এই রকম চেহারা আর গাড়ি হয়, মেয়রের না জানি আরও কত বড় চেহারা আর কত মস্ত বড় গাড়ি।

তারপর এক সময় শংকরের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে পিছন দিকে হেলে বললেন, কি বলছেন কী প্রফুল্লবাবু? ঠিক মতো হচ্ছে? খুব চটপট তৈরী হয়ে নিতে হবে কিন্তু, টেস্টের সময় এসে গেল। এদিকের ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব আমি ঠিক ক'রে রাখব। তুই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নেবার চেষ্টা কর। আর এই তো, প্রজ্ঞাদা আজ তোকে দেখেই গেলেন নিজের চোখে। আমিও আরেকবার ব'লে রাখব তোর কথা। ঠিক আছে তুই আজ যা। আমায় মাঝে মাঝে খবর দিয়ে যাবি। মনে থাকবে তো?

শংকর শুধু বলল, আমি স্যার খুব মন দিয়ে লেগে পড়েছি।

খুশি হয়ে হরেনবাবু ঘাড় কাত ক'রে মাথা নেড়ে তার কথাটাই সমর্থন করলেন যেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে শংকর আরও বেশি ভরসা পেল। হরেনবাবুর সব কথাগুলোই একটা একটা ক'রে মিলে যাচ্ছে দেখল। এই তো নিজে চোখেই আজ সে প্রজ্ঞানারায়ণবাবুকে দেখে এল। আর হরেনবাবু যে তার কথা বলেছেন তারও তো প্রমাণ পেল। হরেনবাবু যে-রকম গলায় বললেন তার কথা আর প্রজ্ঞানারায়ণবাবু যে-রকম চোখে তাকালেন তার দিকে তাই তে।

পরদিন স্কুলের ছুটির পর শংকর যখন প্রফুল্লবাবুর বাড়ির পথ ধরেছে, রাস্তায় পাড়ার বোকাদার সঙ্গে দেখা। শংকর মনে মনে ভাবল এই সেরেছে বুঝি! সে মনে মনে মুখস্ত করতে করতে যাচ্ছিল, বেল্-এস্-প্রী···বেল্-এস্-প্রী। প্রফুল্লবাবু কথাটা শিখিয়ে দিয়েছেন। ফরাসী কথা। খুবি বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোকেদের বলে। এমন ভাবে মনে রাখতে হবে, জিবের ডগায় থাকে কথাটা। সে সব সময় আওড়াতে আওড়াতে পথ হাঁটে শেখানো কথাগুলো। আজও তাই যাচ্ছিল।

এমনি সময় চোখের সামনে দেখে পাড়ার ছেলেদের এক-মাত্র সহায় ও ভরসা, বোকাদা পাতা থেকে চেটে চেটে আলু-কাবলি না কি খাচ্ছে। সারাদিনে বোকাদা এই রকম ক'রে আলুকাবলি, ঘুগনি, দইবড়া, ফুচ্‌কা একটার পর একটা খেয়ে যাবে। সামনাসামনি প'ড়ে গেলে তাদের মতো অনেকে ভাগও পায়।

নামে বোকাদা ছাড়া কাজে কোথাও বোকাদা নয়। গলির মোড়ে ছোট্ট চায়ের দোকানটা থেকে বোকাদা চা খায়। একবার নাকি মাসকাবারি বিল হয়েছিল পাঁচ টাকা ন'আনা। কিছুতেই বোকাদা দাম দেয় না। দোকানের মালিক বনমালি তাগিদ দিয়ে দিয়ে যখন প্রায় নাজেহাল হয়ে গেছে, বোকাদা একদিন দাম দিয়েছে। তবে পুরো পাঁচ টাকা ন'আনা নয়। তিন টাকা ন'আনা। বনমালি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, এটা কি রকম হিসেব হল?

বোকাদা তেড়েফুঁড়ে রেগেমেগে বলেছে, এটাও বুঝলি না বুদ্ধু? জলের দাম বাদ দিয়ে দিয়েছি, বুঝলি? যত সব হাঁদা বোকা এসে জুটেছে পাড়ায়।

বনমালি তো সত্যি থ বনে গেছে।

এই বোকাদার সামনে প'ড়ে গেছে শংকর। অন্যমনস্ক থাকায় তার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেছে, বেল্-এস্-শ্রী।

—কি? কি বললি? চেঁচিয়ে ওঠে বোকাদা।

—না না, ও কিছু না এমনি, লজ্জা পেয়ে শংকর বলে।

—এমনি মানে? এই তো বেল না কৎবেল, কি বললি যেন? বোকাদা চেপে ধরে।

—না না ও কিছু না বোকাদা, ভালমানুষের মতো মুখ চোখ ক'রে সে বলে।

—যাক ও সব কথা। খুব লায়েক হয়েছিস আজকাল না। কোথায় থাকিস পাত্তাই পাওয়া যায় না, রাগ রাগ গলায় বোকাদা বলে।

—কেন, তোমাকেই তো দেখতে পাওয়া যায় না আজকাল, আমতা আমতা ক'রে শংকর বলে।

—ফের ন্যায়েকিপানা হচ্ছে? বলি এবার পুজোর যে একখানা বই নামাবার চেষ্টা করছি তা রিহার্সাল দেবে কে? না বল, আমিই স্টেজের ওপর একা ধেই ধেই ক'রে নাচি, কথা বলতে বলতে চটে ওঠে বোকাদা।

শংকরের মুখ দিয়ে ফস্ ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এবার পুজোয় তো আমি প্লে করতে পারব না বোকাদা।

সত্যিই তো কি ক'রেই বা সে প্লে করে। কত রকম কাজ তার। কত তোড়জোড়। পুজোর পরই হয়তো দলবল মিশরেরর দিকে যাত্রা করবে।

কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলল না শংকর। আলুকাবলির গন্ধে তার মন তখন চনমন করছে। চটে গেলে বোকাদা ভাল ক'রে আলুকাবলি খাওয়াবে বটে।

—বোকাদা আলুকাবলি খাব, শংকর এমন আব্দারের সুরে বলল যেন বোকাদার মন গলে যাবে।

—বেশ তো খা না, একে চার পয়সার দাও তো, বোকাদার ভাবভঙ্গিতে মনে হল মন ভিজেছে।

শংকর আলুকাবলির পাতা হাতে ক'রে খেতে আরম্ভ করেছে।

—বেশ তা'লে আমি অন্য য়্যাক্টর দেখব না, কি বলিস। তুই ক্লাবে আসছিস, বোকাদা ওকে রাজী করার মতো ক'রে বলে।

শংকর মাথা নিচু ক'রে আলুকাবলির পাতা চাটতে চাটতে এমন ভাবে মাথা নাড়ল যাতে হ্যাঁ না দুই-ই বোঝায়। বোকাদা অন্তত বুঝল হ্যাঁ।

শংকর মনে মনে ভাবল, আবার সেই বোকাদার কলকাতা

গুলজার ক্লাবে রিহার্সাল! গতবার স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বোকাদা মাইকে বলেছিল, এবার শারদীয়া পুজোয় কলকাতা গুলজারের নতুন নিবেদন, চোরাকারবারি ও ছোরা মারামারি। এখনও যেন কানের মধ্যে বাজছে বোকাদার কথাগুলো। বুলুর দাদা লিখে দিয়েছিল, আর বোকদা মুখস্থ ক'রে বলেছিল মাইকে।

—কি মনে থাকবে তো? বোকাদা আরেকবার মনে করিয়ে দেয় কথাটা।

হ্যাঁ হুঁ-র মতো একটা মাথা নেড়ে শংকর পালাতে পারলে বাঁচে। আর এখানে দাঁড়ানো বেশিক্ষণ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শংকর আর পিছন ফিরে না তাকিয়ে হাঁটতে শুরু ক'রে দেয়।

প্রফুল্লবিকাশবাবুর বাড়ি গিয়ে যখন পৌঁছল তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বইপত্তর ডিক্সনারি নিয়ে তিনি ব'সে আছেন চেয়ার টেবিল জুড়ে। শংকরকে বললেন, কি, তৈরী হচ্ছে কেমন? সব সময় মনে মনে ভাববি তা হলেই মনে থাকবে। এই রকম ক'রে পাঁচ-সাতটা ভাষা থেকে দেড়শো-দু'শো কথা বেছে বেছে মুখস্থ রাখতে হবে। শক্ত কাজ মোটেই কিছু একটা নয়! মনের জোর আর সত্যিকারের ইচ্ছে থাকলেই লোকে পারে।

যেই প্রফুল্লবাবু থামলেন, শংকর মনে মনে আরেকবার চট ক'রে ঝালিয়ে নিল, লোকটা যদি সংস্কৃতয় গান গায় তো বলতে হবে, সাধু সাধু, হিন্দি হলে, বাহুত বাহুত 'আচ্ছা, ইংরেজী হলে তো কথাই নেই, নাইস নাইস বা লাভলি

লাভলি বা শেষকালে জিনিয়াস। আর যদি শেষ পর্যন্ত বাংলা-তেই গান গায়? কি বলবে? চমৎকার? দূর, চমৎকার বলবে কেন? বলবে আহা! বা মরি মরি, কিংবা আরো ভাল কিছু একটা। শংকর কি তার জন্যে ভাবনায় পড়বে না-কি? মোটেই না। বাংলায় যদি গান গায় তো শংকর একটা দু'টো কথা বলবে নাকি, যত ভাল ভাল কথা জানে সব ব'লে যাবে।

আর শংকরের মাথায় হঠাৎই কথাটা একবার উঁকি মেরে গেল। শংকর সত্যি সত্যিই ভাবছিল, আহা, এমন হয় না লোকটা বাংলা ভাষাতেই গান গাইছে।

আর থাকতে না পেরে সে ব'লে ফেলেছে, স্যার লোকটা কি বাংলায় গান গাইতে পারে না? যেমন ধরুন স্যার, ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমার সোনার বাংলা কিংবা স্যার হাফ সংস্কৃত বন্দেমাতরম (কথাটা বলেছে বোকাদা, কেন না হাফ-সংস্কৃত না হয়ে পুরো সংস্কৃত হলে আমরা অত চট ক'রে গাইতে পারতুম না।)—

তার কথা শুনে প্রফুল্লবিকাশবাবু হেসে ফেলেছেন। বলে-ছেন, ত্যাখ বাবা এটা লটারিতে প্রাইজ পাওয়ার মতো। পিরা-মিডের মাথার ওপর ব'সে আমার সোনার বাংলা গান যদি কেউ গায় তো আমাদের কত বড় সৌভাগ্য বল তো। তবে কি জানিস, প্রাচ্যের লোক তো, পাশ্চাত্যের ভাষায় গান গাওয়ার ইচ্ছেটাই বেশি হয়। আর ফরাসী ভাষাটা শুনেছি খুব চলে। শুনতেও নাকি মিঠে। তাই আমার মনে হয়—

প্রফুল্লবাবু কথা শেষ না করলেও সে বুঝতে পারে কি বলতে চান তিনি। আবার ভাবল মনে মনে একবার, তবে সেই

বেল্-এস্-থ্রী-রই জয় ! আর ভাবা মাত্রই তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, বেল্-এস্-থ্রী।

প্রফুল্লবাবু তার মুখ থেকে কথাটা অমন কায়দায় বেরুতে শুনে খুশি হয়ে তাকালেন তার দিকে। তবে আরো একটু কায়দা ক'রে বলা যায় কি ভাবে, তাও বলে দিলেন।

—ভাল কথা, আজ সকালেই ফোন করছিলেন হরেনবাবু। ওঁর বন্ধু কাউন্সিলার, কি নাম যেন…

—প্রজ্ঞানারায়ণবাবু স্যার, প্রফুল্লবাবু একটু থামামাত্রই সে ব'লে দেয় নামটা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রজ্ঞানারায়ণবাবুর সঙ্গে ওঁর কাল রাত্তিরে কথা হয়েছে তোর ব্যাপারটা নিয়ে। শিগগিরই একটা য়্যানাউন্সমেণ্ট্ বেরুবে, একটা ঘোষণার মতো। তোর কথা মেয়রের কাছে পেড়েছেন। এবার তুই চটপট তৈরী হওয়ার চেষ্টা ক'রে নে।

প্রফুল্লবিকাশবাবুর কথা শেষ হলে শংকরের মনে হল তার নিজের কানেই তো শুনেছে সে কথাগুলো না কি ? আর সেদিন সন্ধ্যেবেলা সেও তো উপস্থিত ছিল হরেনবাবুর বাড়ি। তবে সে বেরিয়ে আসার পরই হরেনবাবু কথা বলেছেন প্রজ্ঞানারায়ণ-বাবুর সঙ্গে। যা দেখছে আর যা শুনছে তাতে শংকরের বুক আনন্দে আর আশঙ্কায় ঢিপঢিপ করতে থাকে।

—আমিও স্যার হরেনবাবুর ওখানে প্রজ্ঞাবাবুকে দেখেছিলুম সেদিন, খুশি আর চাপতে না পেরে সে ব'লে ফেলে।

—তবে তো ঠিকই আছে। তুই এবার রেডি হয়ে নে, প্রফুল্লবাবু বললেন তাকে খুব মিহি গলায়।

শংকর সেদিন সন্ধ্যায় আরো কিছুক্ষণ থেকে প্রফুল্লবিকাশ-বাবুর কাছ থেকে দরকারি কথার আরো একটা বড় ফর্দর

মতো নিল। নতুন আরো পঞ্চাশটা কথার একটা তালিকা। রীতিমতো ঘাবড়ে যায় শংকর। আরো কত দেবেন কে জানে। শেষকালে কি একটা বলতে আরেকটা ব'লে ফেলবে। এবার একবার জিজ্ঞাসা ক'রে নেওয়া ভাল।

—স্যার, এরপরও আরো দেবেন? খুব ভয়ে ভয়ে নিচু গলায় সে জিজ্ঞাসা করে।

—আর তো হয়ে এল। শ চারেক কি পাঁচেক কথা তো বাছতেই হবে। তারপর দেড়শো-তু'শো কথা তা থেকে বেছে নিলেই চলবে, প্রফুল্লবাবু এমন ক'রে বলেন যেন এ আর কি কঠিন কাজ।

প্রফুল্লবিকাশবাবুর কাছে পড়াশুনো করতে আসার এই এক বিপদ। একটা জিনিসের জন্যে কম ক'রে তিনি পাঁচ দশটা জিনিস ঘাঁটবেন। এতে তাদের কি কম অসুবিধে! হয়তো কোনো এক বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল ছোট্ট একটা প্রশ্ন। যদি তাঁর মনোমতো হল বা বিশেষ জানার মধ্যে প'ড়ে গেল তো রক্ষে নেই। পাঁচ মিনিটের জায়গায় কমসে কম পঁচিশ মিনিট সময় নেবেন। আর এই কারণে, ছাত্ররা তো দূরের কথা, মাস্টারমশাইরাও অনেক সময় ইচ্ছে থাকলেও তাঁকে চট ক'রে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান না।

২

পরের দিন সকালে শংকর নিয়ম মতো স্কুলে গেল।

দারোয়ান শিউনন্দনের সঙ্গে দেখা হতেই বলল, হেডমাস্টার সাব বোলাতা।

এ-সময় আবার হেডমাস্টারমশায়ের ডাক পড়ল কেন। মাইনে তো সে নিয়মিত চুকিয়ে দিয়েছে। আর পড়াশুনোর

ব্যাপারে সে তো ব'লেই রেখেছে, সংস্কৃতয় আর অঙ্কে যদি ভাল না করতে পারে তো স্কুলেই থাকবে না। বাবাকে ডেকে কিছু বলতে চান তিনি? সেইখানেই বেশি ভয় তার। কি জানে কী আবার বলবেন।

নানান কিছু ভাবতে ভাবতে সে গিয়ে দাঁড়ালো হেডমাস্টার-মশায়ের সামনে।

খুব গম্ভীর মুখে তার দিকে কাগজপত্তর থেকে চশমা আঁটা চোখ তুললেন তিনি। খুব ভারি গলায় আস্তে বললেন, তোমার খবর সব পেলুম।

এই সেরেছে রে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। শংকর যা ভয় করছিল তাই। বাবার কানে তুললে একেবারে ঘরে বন্ধ। বাড়ি থেকে বেরুলেই ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেবে। হেডমাস্টার প্রপন্নপালকবাবুর কথা কি বাবা উড়িয়ে দিতে পারবে।

—কী স্যার? খুব ভয়ে ভয়ে বিনয় ক'রে নরম গলায় শংকর বলল।

—ওই হরেনবাবু তোমায় যা বলেছেন, সেই সব আর কি, শংকর তাঁর কথার উত্তরে কিছু না বলে মাথা নিচু ক'রে বুকের মধ্যে ক'টা তাল পড়ে গুনতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

—তা তোমার তৈরী হয়েছে কেমন? মানে সব রকম তৈরী আর কি।

প্রপন্নপালকবাবু যখন থামলেন তখনও শংকর বিশ্বাস করতে পারল না কথাগুলো তিনি তাকেই বলছেন। কি যে বলবে তা সে ভেবেই উঠতে পারে না।

—অনেকখানি হয়েছে স্যার, সাহস ক'রে ব'লেই ফেলল সে।

—অনেকখানি হলে তো হবে না, সবটাই তো হওয়া চাই। তুমি একবার ঈশ্বরভক্তবাবুর সঙ্গে দেখা করো। আরেক ধরনের যে টেস্ট হবে সে বিষয়ে উনি তোমায় সাহায্য করবেন। চটপট নাও, সময় তো হয়ে এল। তোমাকে যে পাঠানো হবে স্কুলের ছেলেদের কাছে সে খবরটাও তো আমাদের দিতে হবে।

কথা শেষ ক'রে মাথা নিচু ক'রে আবার নিজের কাজে মন দিলেন হেডমাস্টারমশাই।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শংকর ভাবল, তবে সব কথাই পাকাপাকি। না হলে হেডমাস্টার পর্যন্ত কথাটা পৌঁছল কি ক'রে। কিন্তু এবার তো আর সত্যিই চোখ বুজে ব'সে থাকা যায় না। তাকে তো উঠে প'ড়ে লাগতে হবে। এত কথাবার্তার পর সে যদি শেষ পর্যন্ত পিছু হাঁটে তা হলে সব চেয়ে আগে মান যাবে হরেনবাবুর। কারণ হরেনবাবুর মুখ থেকেই সব চেয়ে আগে সে খবরটা পেয়েছে। আর হরেনবাবুর উৎসাহ পেয়েই সে এতদূর এগিয়েছে। হরেনবাবুর কথার দাম যদি সে না রাখতে পারে তো সে কি করল কাজের কাজটা।

ছুটির পর তিমির আর অমল তাকে ধরল। কাল সেভ্‌ন এঞ্জেল্‌সের সঙ্গে খেলা। কাল তো তাকে খেলতেই হবে। আগের গেমটা ড্র হয়েছে। অমলের খাঁটি বিশ্বাস শঙ্কর থাকলে তারা অনায়াসে গেমটা জিততে পারত। যাই হোক এবারের গেমে তাদের জেতা চাই-ই। আর শংকর যদি খেলে তো জেতা কিছুমাত্র শক্ত হবে না।

—কিরে, খেলবি তো কাল? তিমিরবরণ জিজ্ঞাসা করলে শংকর ঘাবড়িয়ে যায়। এখন যে তাকে কখন কার দরকার হয় বলা খুব মুশকিল। সুতরাং শংকর পাকা কথা দিতে পারে না

কাউকেই চট ক'রে। তাই তিমিরের কথায় সে একটু ভাবনায় পড়ল বই কি! তা ছাড়া শংকরের মনে এখন সদাসর্বদা যে রকম ভাবনা তাতে কি ভাল ক'রে বলও রাখতে পারবে সে দু' পায়ের মধ্যে। খেলার মাঠে নেমে খেলতে না পারলে সে আরেক লজ্জা। তাই সব কিছু ভাবতে ভাবতে শংকর শেষ পর্যন্ত ব'লেই ফেলল, তোরা এ দু'-চারটে গেম ম্যানেজ ক'রে নে না ভাই, আমি তারপর ঠিক খেলব।

—ও! তোর খুব ডাঁট বেড়ে গেছে আজকাল, তিমির বুঝি আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না তার কথায়।

—রাগ করিস নে ভাই অমল। আজকাল বাবা যে-রকম নজরবন্দী রাখেন। সংস্কৃতয় আর অঙ্কে যদি পাশ না করতে পারি তো ঠিক পাঠিয়ে দেবে জব্বলপুরে, সে অমলশংকরকে নরম করার চেষ্টা ক'রে বলে।

তিমির ছাড়ার পাত্তর নয়। আবার ঝাঁঝ নিয়ে বলে, ও সব পুরনো গুল আমার কাছে চালাস নে, আমি সব বুঝি, বুঝলি? আমি যেন সংস্কৃতয় ফেল মারি নি না? কতবার সংস্কৃতয় পাশ করেছি বল তো? আর অমল? সেই নিচু ক্লাশে কবে দু'বার পাশ করেছিল অঙ্কে, কি রে অমল? আমরা ম্যাচ খেলছি না, না? দেখিস এবার কত তুলি স্যানৃসক্রিটে।

কথার শেষে তিমির দু'টো আঙুল দিয়ে বুকের ওপর টোকা মারে। অমর তিমিরের মুখের দিকে চেয়ে তার কথায় সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ে।

কি যে বলবে শংকর এ কথার পালটা জবাবে ভেবে পায় না। শেষকালে নিরুপায় হয়ে মাথা তুলে বলে, আচ্ছা, আমি খেলব যা।

—সাবাস্ সাবাস্ ! অমল আর তিমির দু'জনেই লাফিয়ে ওঠে তার পিঠে চাপড় মেরে।

যখন ঈশ্বরভক্তবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো তখন স্কুলে আর একটিও ছেলে নেই বললেই চলে। তারই জন্যে অপেক্ষা ক'রে বসেছিলেন তিনি।

শংকর তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, এই যে আমি তোমার জন্যে বসেছিলুম শংকর।

সাহেবরা যেমন কষ্ট ক'রে বাংলা কথা বলে, সেই রকম ঢঙে ঈশ্বরভক্তবাবু কথা বলেন। আর তাইতেই তার আরো বেশি ক'রে মনে হয় তাঁর নাম নিশ্চয় ঈশ্বরভকত্।

—হ্যাঁ স্যার, হেডমাস্টারমশাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন, শংকর দু'হাতের তালু ঘষতে ঘষতে বলে।

—হ্যাঁ, আমি তো সব শুনলুম। তোমায় একটু ভাল ক'রে ট্রেনিং দিতে হবে। ছুটির পর কোথায় যেতে পারবে ? ঈশ্বর-ভক্তবাবু সোজাসুজি জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন।

—যেখানে খুশি স্যার আপনার। তবে স্কুলের কাছাকাছি কোথাও নয়, শংকর অনুরোধ ক'রে বলে তাঁকে।

—কেন ?

—না স্যার, এখানে হলে স্কুলের ছেলেরা সব ভিড় করবে। কোনো কাজ হবে না।

তার কথায় হেসে ফেললেন ঈশ্বরভক্তবাবু। মাথা নিচু ক'রে কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। গেম টিচার ঈশ্বরভক্তবাবুকে কেউ কোনোদিন ভাবনা চিন্তা করতে দেখে নি। একমাত্র শংকর ঘোষালের কথায় তিনি আজ চিন্তায় পড়লেন।

শেষকালে ঠিক হল ঘোড়দৌড়ের মাঠের পিছনে খোলা

জায়গায় যাওয়া হবে। তাঁদের সঙ্গে থাকবে দারোয়ান শিউনন্দন দড়ি, মোটা দড়ির মই, দু'টো ফুটবল, চারটে বড় বড় উঁচু টুল, মাছধরার জালের মতো মস্ত একটা বড় জাল, দু'টো মাঝারি সাইজের ঝুড়ি, হালকা বেঁটে বালতি গোটা দুয়েক। এ ছাড়া সঙ্গে থাকবে এক ডজন লেমনেডের বোতল, আধ ডজন নেবু আর ছোট সুটকেসের সাইজের বরফ চাঁই। এ ছাড়া ঈশ্বর-ভক্তবাবুর পকেটে থাকবে চিউইংগামের প্যাকেট।

দরকারি জিনিসপত্তর নিয়ে শিউনন্দন একটা লরিতে ক'রে আগে চ'লে যাবে। তারপর শকংর আর ঈশ্বরভক্তবাবু গিয়ে হাজির হবে।

ঠিক হল এমনি ক'রে ট্রেনিং-এর মহড়া চলবে। আর দেরি ক'রে লাভ নেই। হাতে সময় নেই বললেই চলে। কাল থেকে শুরু হবে। শংকর যেন তৈরী থাকে।

এই মরেছে! কালই তো সেভ্‌ন এঞ্জেল্‌সের সঙ্গে খেলা। স্কুলে এলে তো রক্ষে রাখবে না তাকে অমল আর তিমির। কি করে?

সে বলল, কাল তো আমি স্যার স্কুলে আসব না। মা-র সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে। খুব দরকারি কাজ। বলুন আপনি কোথায় থাকবেন, আমি জায়গা খুঁজে নেব।

তার দরকারের কথা শুনে ঈশ্বরভক্তবাবু না হেসে পারলেন না।

আবার শংকর তাঁকে চিন্তায় ফেলল। মাথা নিচু ক'রে আবার তিনি কি ভাবতে লাগলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন, না সে ঠিক হবে না। অত বড় মাঠে তুই কোথায় খুঁজবি। তার চেয়ে এসপ্লানেডের কাছে এসে মেট্রো সিনেমার নিচে

দাঁড়াবি। আমি তোর জন্যে অপেক্ষা করব। আর যদি আসতে একটু দেরী হয়তো অপেক্ষা করবি।

মেট্রো সিনেমার কথা মনে আসতেই তার মনটা খুশিতে টগবগ করে। এই তো সেদিন ছোটমামা তাকে মেট্রো সিনেমায় চ'লে আসতে বলে সোজা। সে প্রথমে ভিড়ে দেখতেই পায় নি ছোটমামাকে। তারপর ভিড়ের মাঝখানে টিকিটশুদ্ধ হাত উঁচু ক'রে তুলে ছোটমামা টিকিট দু'খানা নাচাচ্ছিল। দেখতে পেয়ে শংকর আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে। সেই মেট্রো সিনেমা!

—আচ্ছা স্যার আমি ওখানেই দাঁড়াবো, ব'লে শংকর ঈশ্বরভক্তবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিল। মেট্রো সিনেমা খুব পয়মন্ত জায়গা। ওখানে দাঁড়ালে কোনো কাজে কেউ অসফল হয় না। শংকর ভেবেছিল ছোটমামা হয়তো টিকিটই পাবে না, যা ভিড়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছোটমামা ঠিকই পেয়েছিল টিকিট।

তারপর দিন শংকর স্কুলে গেল না। ঠিক সময় মেট্রো-সিনেমার নিচে গিয়ে ঈশ্বরভক্তবাবুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। শংকরের মা জিজ্ঞাসা করেছেন, কি রে, আজ স্কুলে যাবি না?

শংকরের চট ক'রে মনে এল তাই ব'লে বসল, আজ আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারমশাই, প্রপন্নবাবুর পঞ্চান্ন বছর পূর্ণ হল কিনা, তাই স্কুল হবে না।

শংকরের মা মনে ভাবলেন হবেও বা, তাই আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না।

হঠাৎ হঠাৎ প্রশ্নের জবাবে রেডি-মেড জামার মতো কতক-গুলো রেডি-মেড উত্তর থাকার দরকার। যে সব প্রশ্ন তাদের

মা-বাবা, বা দাদা-দিদিরা মাসের মধ্যে যখন তখন একশোবার জিজ্ঞাসা ক'রে বসতে পারেন। যেমন নাকি, আজ ইস্কুল গেলি না কেন? কেন, আজ আবার ছুটি কিসের? কোথায় চললি আবার?—এই রকম ছোট-খাট পঞ্চাশটি প্রশ্নের একটি তালিকা তৈরী ক'রে তাদের রেডি-মেড উত্তর কি হতে পারে তাও ভেবে ঠিক করেছে বোকাদা। অনেকটা প্রশ্নোত্তরের মতো আর কি। বোকাদা বলেছে, ভেবে এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে দেরি হয়ে যাবে, আর মা কিংবা দিদি ভাববে স্রেফ গুল চালাচ্ছিস। মা কিংবা দিদিদের যদিও বা গুল চালানো যায়, বাবা কিংবা দাদাদের কাছে মিথ্যে ব'লে কেটে পড়া অনেক সময় মুশকিল। তাই এই প্রশ্নোত্তরের তালিকাটি একেবারে কণ্ঠস্থ রাখা উচিত। এর ওপর বেশি যা দরকার তা হল নিজের বুদ্ধি। যে যত বেশি চটপট বলতে পারবে, একেবারেই ঘাবড়ে যাবে না, ভাবখানা এমনই যেন প্রশ্ন শোনবার আগেই উত্তর জিবের ডগায় নিয়ে ব'সে আছি।

একা দাঁড়িয়ে কি করবে, তাই শংকর সময় কাটাবার জন্যে মনে মনে তালিকাটা একবার আওড়ে নিল। ভিড়ের মাঝখানে ধুতি পাঞ্জাবি-পরা টার্জনের মতো ঈশ্বরভক্তবাবুর মস্ত দেহটা সবাইকে ডিঙিয়ে তার চোখের সামনে একটা মস্ত বড় প্রকাণ্ড সাইনবোর্ডের মতো ঝুলতে লাগল। সে এক ছুটে দৌড়ে এল তাঁর কাছে। সাত ফুট ঈশ্বরভক্তবাবুর না হলে চার-ফুট আট-ইঞ্চি শংকর ঘোষালকে খুঁজতে একটু সময় লাগত বইকি।

তারপর দু'জনে মিলে একটা বেবি-ট্যাকসিতে গিয়ে উঠল। ঘোড়দৌড়ের মাঠের পিছনে শিউনন্দনের লরি দাঁড়িয়েছিল।

সব কিছু দেখে-শুনে শংকরের সাহস আর উৎসাহ খুব বেড়ে গেল। ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়ম বেঁধে সব ঠিক ঠিক সময়ে হয়ে যাচ্ছে। কোথাও এতটুকু কোনো গোলমাল নেই। হরেনবাবু জিওগ্র্যাফি পড়াতে পড়াতে বলেন না, প্রাকৃতিক নিয়মে কোথাও সামান্য মাত্র বিশৃঙ্খলা নেই। তার হঠাৎ মনে হল, খবরটা আস্তে আস্তে ছড়াবার পর, হরেনবাবু, প্রফুল্ল-বিকাশবাবু, ঈশ্বরভক্তবাবু এঁরা যেন একটা প্রাকৃতিক নিয়মেই কাজ ক'রে চলেছেন। যাঁর কাছে তার যতটুকু দরকার তিনি তাকে সেই ভাবে সাহায্য ক'রে যাচ্ছেন। ঈশ্বরভক্ত-বাবুকেও এখন ঘোড়দৌড়ের মাঠে দেখে শংকরের মনে হল তিনিও কেমন ক'রে একটা প্রাকৃতিক নিয়ম হয়ে গেছেন। মায় শিউনন্দন পর্যন্ত। যে শিউনন্দন খুব খাতিরের লোক ছাড়া কারো কথা কানেই তোলে না, সেও আদেশ পালনের জন্যে তৈরী আছে।

তারপর গেম টিচার ঈশ্বরভক্তবাবুর ট্রেনিং দেওয়া শুরু হল।

খেলার মাঠের জন্যে অন্যরকম পোশাক আছে ঈশ্বরভক্ত-বাবুর। তাই প'রে নিলেন। শংকর তাদের ক্লাবের জার্সি প'রেই বেরিয়েছিল।

ঈশ্বরভক্তবাবুর হাতঘড়ি সময় ব'লে দেবে। আর সেই সময়ের মধ্যে একটা পরীক্ষা দিয়ে দিতে হবে। এমনি ক'রে ঈশ্বরভক্তবাবু আবার সময় দেবেন হয়তো পাঁচ কি সাত মিনিট, তারই মধ্যে শংকরকে আরেকটা কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে।

শংকর একবার ভাবল এই পরীক্ষাই তো আসল পরীক্ষা।

এ সব পরীক্ষায় পার হতে হবে, তবেই তো প্রফুল্লবিকাশবাবুর কাছে যা শিখছে তা কাজে লাগাতে পারবে। আগে তো চারশো একাশি ফুট উঁচুতে উঠতে হবে, তারপর শুনতে পাবে, লোকটা ফরাসী ভাষায় গান গাইবে না জর্মান ভাষায়, ইংরেজীতে গান গাইবে না বাংলায়।

তাই ঈশ্বরভক্তবাবু যা বলবেন ভাল ক'রে শুনে বুঝে নিতে হবে। তারপর চোখের নিমেষে ক'রে দেখিয়ে দিতে হবে সেটা।

সার্কাসে কিংবা রাস্তায় চীনেম্যানরা যে রকম মজার খেলা দেখায় বা ম্যাজিক, এ যেন অনেকটা সে রকম।

এক হাতে একটা বালতি আর এক হাতে একটা ঝুড়ি নিয়ে শংকর মাথায় একটা ফুটবল নাচাতে লাগল। হেড দিয়ে গোল দিতে শংকরের জুড়ি খেলার মাঠে আর কেউ থাকে না। তাই প্রায় এক হাতে বালতির জল, আর অন্য হাতে ঝুড়ির ফল সামলাতে সামলাতে শংকর শূন্যে ফুটবলটাকে হেড করতে লাগল, প্রায় চার মিনিট ধ'রে। শিউনন্দনও অবাক হয়ে শেষে হেসে ফেলল।

তারপর শংকর দু'হাতে দু'টো ঝুড়ি নিয়ে গাছের ডালে আটকানো মোটা দড়ির মই বেয়ে কতখানি উঠতে পারে, আর কত তাড়াতাড়ি উঠতে পারে তারো একটুখানি পরীক্ষা হল। শংকর ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরভক্তবাবু আর শিউনন্দন জাল ধ'রে দাঁড়িয়ে পড়ল। শংকর পড়ত না, খুব বেশি উঁচুতে উঠতে হবে না। তবু ঈশ্বরভক্তবাবুর নির্দেশ মতো সে ইচ্ছে ক'রেই পা-ফসকিয়ে নিচে পড়ল। আর ঝুড়িশুদ্ধ জালের ওপর প'ড়ে ঠিক ঢেউয়ের মাথায় দোলার মতো দুলতে লাগল। শিউনন্দন

আর ঈশ্বরভক্তবাবু খুব হুঁশিয়ার হয়ে শক্ত চারখানা হাতে জাল ধ'রে ঠায় দাঁড়িয়ে।

সেদিন বাড়ি ফিরে গা-হাত-পায়ে শংকরের সে কী ব্যথা!

শংকর ভাবল এক দিনেই এই। এখনো ট্রেনিং চলবে বেশ ক'টা দিন। নেহাৎই তার মতো চটপটে ছেলে ব'লে, না হলে আরো বেশি সময় লাগত।

শংকর পাশ ফিরতে গিয়ে উহু-হু ক'রে ওঠে। সমস্ত শরীর এমন টনটন করতে থাকে যে ঠিক মনে হবে এক সঙ্গে তিনটে ফুটবল ম্যাচ
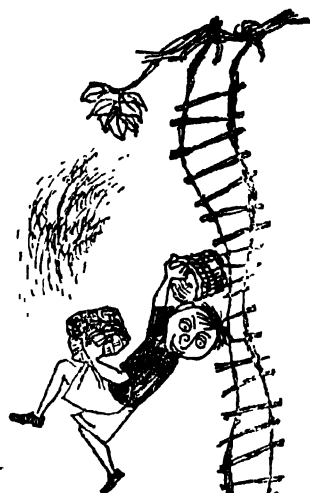
তবু ঈশ্বরভক্তবাবুর নির্দেশ মত সে ইচ্ছে ক'রেই পা-ফসকিয়ে নিচে পড়ল।

খেলে এসেছে। বিছানায় শুয়ে বার বার মনে পড়ে সংস্কৃতর টিচার নিখিলেশ্বরবাবুর উপদেশের কথা, বিবেকানন্দর বাণীতে আছে বুঝলি, চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না। কলম থেকে

কালি ছিটিয়ে বিসর্গ সমস্যা সমাধান করবি, তা হলে আমাকেও আর এ বয়সে বই দেখে আসতে হত না ভোর রাতে উঠে একবার।

ঠিকই বলেছেন নিখিলেশ্বরবাবু, কষ্ট না করলে কবে কেষ্ট মিলেছে। গা-হাত-পা ব্যথা করবে না অথচ একলাফে পিরামিডের মাথার ওপর উঠে যাব, তাও কি সম্ভব নাকি। সে তো তবু ফুটবল হেড করছে, এমন এক এক জন খেলোয়াড়ের কথা শুনেছে যাঁরা তার বয়সে বাতাবি নেবু হেড দিতেন। আর কি জোর হেডের, টেনিশ বলের মতো নাচত বাতাবি নেবুগুলো তাঁদের মাথায়। এক জনের গোল মাথাও নাকি তেকোণা হয়ে গিয়েছিল। এই না হলে হাজার হাজার দর্শকের হাততালি কুড়িয়ে মাথা দিয়ে একটিবার মাত্র বল ছুঁয়ে খেলার মাঠের আবহাওয়াই পালটিয়ে দিতে পারে। শ্রদ্ধায় শংকরের মাথা নুয়ে আসে। গায়ের ব্যথার কথা আর মনেই থাকে না।

শংকরের ঘুম আসে না যতই ভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে, কবে ট্রেনিং শেষ হবে ঈশ্বরভক্তবাবুর কাছে। প্রফুল্লবিকাশবাবুর দেওয়া লিস্ট সে তো প্রায় মুখস্থ ক'রে এনেছে। আর একটি মাত্র পরীক্ষা দিতে হবে ঈশ্বরভক্তবাবুর কাছে। ব্যাস! তা হলেই বাজিমাৎ!

ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই শংকর চোখ বুজল, আর দেখল অনেক উঁচু গাছের ডাল থেকে মস্ত লম্বা দড়ির মই ঝুলছে। শংকর তরতর ক'রে মই বেয়ে একেবারে সেই মাথায় পৌঁছে গেছে। দারোয়ান শিউনন্দন আর গেম টিচার ঈশ্বরভক্তবাবু জাল ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন ঘাড় সোজা ক'রে চোখ ওপর দিকে তুলে। তারপর যেই ঈশ্বরভক্তবাবু তলা থেকে হাঁক দিলেন, নাউ লিপ্।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই শংকর পাখির মতো শূন্যে দু'হাত ছড়িয়ে ভাসবার মতো ক'রে ডিগবাজি খেতে খেতে চক্ষের নিমেষে পাতা জালের ওপর এসে পড়ল। সুইমিং পুল থেকে শংকর এমনি ক'রেই শূন্যে হাত-পা ছড়িয়ে জলের মধ্যে এসে পড়ে, আর কী ভয়ানক শব্দ ওঠে জল থেকে।

শংকর দেখল, সে জালের ওপরে পড়ামাত্র ঈশ্বরভক্তবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন, সাবাস সাবাস।

দেখাদেখি শিউনন্দনও ব'লে ওঠে, বাহুত আচ্ছা বাহুত আচ্ছা।

শংকরের চোখ শেষে ঘুমে জড়িয়ে এল, আর ঘুমিয়েও পড়ল সে।

এরপর দু'হপ্তা শংকর আর নিশ্বাস ফেলবার সময়টুকু পেল না। প্রফুল্লবিকাশবাবুর সঙ্গে এখন আবার ঈশ্বরভক্তবাবুর কাজের লিস্ট। যদিও প্রফুল্লবাবুর তালিকার মতো লম্বা নয়, তবু ঈশ্বরবাবুর এক একটা পরীক্ষা নয় তো, এক একখানা হাড় বা পাঁজরা খসিয়ে ফেলা। প্রফুল্লবাবুর পড়াশুনোর ব্যাপারে না-হয় মনের মধ্যে যত ভয় ভাবনা আর দুশ্চিন্তা। কিন্তু ঈশ্বরভক্তবাবুর এক একটা পরীক্ষার শেষে গা হাত-পা, ঘাড়-পিঠের ব্যথা-বেদনা চলতে-ফিরতে মনে করিয়ে দিচ্ছে তার নিজের হাত পা নিয়ে সে আর বেশিদিন চলাফেরা করতে পারবে না, কিম্বা তার শরীরে এখন অন্য লোকের চারটে হাত-পা।

দেখতে দেখতে সেই দিনটিও এসে গেল।

হেডমাস্টারমশাই প্রপন্নপালকবাবু ছুটির পর স্কুলের সব ছেলেদের একটা জরুরী প্রয়োজনে জড় করলেন। সেক্রেটারী,

বিষণ্ণভূষণবাবুও উপস্থিত থাকলেন।

গম্ভীর গলায় হেডমাস্টারমশাই বলতে শুরু করলেন, তোমরা জান বোধ হয় বেশ কিছুদিন ধ'রে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-মন্ত্রী, কলকাতার মেয়র, ডেপুটি মেয়র, অলডারম্যানদের কেউ কেউ ও কয়েকজনের মধ্যে একটা ব্যাপার নিয়ে রীতিমতো জল্পনা-কল্পনা চলছে। ব্যাপারটা একদিকে যেমন মজার, অন্যদিকে তেমনি কষ্টকর। পিরামিডের মাথার ওপর, মিশরের সব চেয়ে উঁচু পিরামিড আর কি, একটা সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকের খবর পাওয়া গেছে। সেই লোকটাকেই নামিয়ে কলকাতা শহরে আনার একটা পরিকল্পনা চলছে। আর এ-খবর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কানেও তোলা হয়েছে। তিনি শুনে খুব খুশি হয়েছেন। সব রকমে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কলকাতার মেয়রকে।

এ-কারণে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল ছাত্রদের মধ্যে একটা নির্বাচনের মতো হবে। নির্বাচিত ছেলেটিকে একটি দলের সঙ্গে পাঠানো হবে। কারণ পিরামিডের মাথার ওপর থেকে লোকটিকে সে-ই নামিয়ে আনবে।

তোমরা বুঝতেই পারছ, এ-কাজের জন্যে যে ছেলেটিকে পাঠানো হবে সে খুবই সাহসী ও চটপটে ছেলে হবে।

দু'ধরনের পরীক্ষার পর নির্বাচন করা হবে। ছেলেদের সেই মতো ট্রেনিং-এরও ব্যবস্থা করা হবে।

তোমরা শুনে নিশ্চয় সুখী হবে যে এই স্কুলের অষ্টম মানের ছাত্র শ্রীমান শংকর ঘোষাল এই বিশেষ উদ্দেশ্যে ট্রেনিং নিচ্ছে। তোমরা জান শংকর ঘোষালের মতো ভাল স্পোর্টসম্যান আমাদের স্কুলে কেন, সারা বাংলা দেশেও বেশি আছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ। সে-কারণে আমরা সমস্ত রকম ভাবে তাকে

সাহায্য করবার জন্যে মনস্থ করেছি।

আমার খুব আশা শংকর নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করবে। সে আমাদের মুখ রাখবে। শুধু এই নির্বাচনের পরীক্ষায় নয়, আরো বড় পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে আমাদের স্কুলের তথা সারা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে।

স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী তথা সমস্ত ছাত্রদের তরফ থেকে আমি শংকরকে আমাদের সমবেত শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাবো।

হেডমাস্টারমশাই কথা শেষ করা মাত্র, সে কী হাততালির বহর। ছেলেদের হাততালির চোটে কান ফাটবার উপক্রম। শংকর মাথা নিচু করেছিল। দেখল হরেনবাবুও হাততালি দিয়েছেন। শেষে হাত তুলে ছেলেদের থামতে বলেছেন। শংকর আড় চোখে লক্ষ্য করল তিমির আর অমলের দু'জনের কেউ-ই যেন খবরটা শুনে খুশি হতে পারছে না। এখনই এই, না জানি পরে কি করবে। হয়তো আর বন্ধুই থাকবে না তার। ওরা দু'টোয় যেন ভাবতেই পারে নি খবরটা এমন নির্জলা সত্যি হতে পারে।

যাক এরপর বেশ ক'টা দিন শংকরের আর স্কুলে যেতে হল না। হেডমাস্টারমশায়ের কাছ থেকে ছুটির ব্যবস্থা ক'রে নিল। কারণ সামনেই তো নির্বাচন। আর এর মধ্যে কবেই বা ক্লাশে আসবে, আর কবেই বা ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাবে। শংকর আর কিছু না হোক অমলশংকর আর তিমিরবরণের মতো দু'টো শয়তান আর শত্রুর হাত থেকে বাঁচবে।

দরকারি কাজ যা কিছু করার সবই সেরে রাখল। ঈশ্বর-

ভক্তবাবু মস্ত এক সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। বললেন প্রফুল্ল-বিকাশবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে আন, আমি সই ক'রে দেব। প্রফুল্লবাবুর জোরালো ভাষা আর ঈশ্বরভক্তবাবুর জমকালো সই, দু'য়ে মিলিয়ে সার্টিফিকেট তৈরী হল শংকর ঘোষালের জন্যে।

এ ছাড়া হরেনবাবুর টুকিটাকি উপরি উপদেশ সে সবও শংকর হরেনবাবুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে নিয়ে রাখল।

এরপরই শংকরের দিন আর রাত কাটা যেন একটা দুর্ভাবনা হয়ে দাঁড়ালো। সকাল হলে শংকর ভাবে কখন রাত আসবে, আবার রাত এলেই ভাবে আকাশ কখন ফরসা হবে।

এমনি ক'রে একদিন শেষে সত্যি সত্যিই নির্বাচনের পরীক্ষা হয়ে গেল। ভয়-ভাবনায় শংকরের তো নাওয়া-খাওয়া ছাড়ার মতো হল। শংকরের বাবার চোখে সব কিছু না পড়লেও শংকরের মা'র নজর এড়ালো না। তিনি বললেন, কি রে শংকর, কা হয়েছে রে তোর ?

এ সব প্রশ্ন কি শংকরের এখন ভাল লাগার কথা। তার এখন মরণ-বাঁচন প্রশ্ন। কি বুঝবে মা তার অসুবিধের কথা। শংকরের মেজাজ ঠিক থাকে না। তাই ভাবে, দাঁড়াও এমন একটা কিছু বলব যাতে তোমার মাথাও গোলমাল হয়ে যাবে। শংকর বলল, বাবার ফাউন্টেনপেনের মাথাটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছি মা।

—সে কী রে! আমি কিছু জানি না বাপু, যা ভাল বুঝিস কর।

কোথায় তাকে সান্ত্বনা দিতে এসে শংকরের মা নিজেই ফাঁপরে প'ড়ে যান। শংকর মনে মনে ভাবে আর হাসে, এই বার বোঝ ঠ্যালা। বাবার ফাউন্টেনপেনের মাথা হারিয়ে

গেলে আমার সঙ্গে তোমার মাথাও হারিয়ে যায়। আর আমার যদি কিছু উলটোপালটা হয়ে যায় তো ক'টা লোকের মাথা হারাবে তা তুমি যদি একবার জানতে মা!

হরেনবাবু শংকরকে ব'লে রেখেছিলেন, আমি ভেতর থেকে খবর নিয়ে রাখব। তুই ক'টা দিন পর চুপি চুপি আমার সঙ্গে এসে দেখা করবি।

শংকরের আর একদম তর সইছিল না। সে দুয়েকটা দিন আগে গিয়েই হাজির হল হরেনবাবু স্যারের বাড়ি।

ওকে দেখে খুবি খুশি হলেন হরেনবাবু। বললেন, আমার বরাবরই বিশ্বাস ছিল তুই ভালই করবি। তবে ভয় ভাবনা একটু থাকা স্বাভাবিক। আমি ঠিক সময়ে খোঁজ নিয়েছি। তোর সব খবরই ভাল। খালি হিন্দির সঙ্গে বার বার বাংলা মিশিয়ে ফেলেছিস। যাক ওটা ঠিক হয়ে যাবে।

শংকর মাথা হেঁট ক'রে লজ্জা পেয়ে বলে, স্যার ও গণ্ডগোলটা খুব বেশি হয়। আর স্যার হিন্দি রষ্ট্রাভাষা হবে তো। চট ক'রে হিন্দি ঠিক বলাটাও মুশকিল। বাংলা ব'লে ব'লে তো অভ্যেস স্যার আমাদের।

—যা ঠিক আছে। তোর ভাবনার কিছু নেই। ধ'রে রাখ তুই সিলেকটেড। হরেনবাবু কথা বলা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই শংকর মাথা নিচু ক'রে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

খবরটা পাকাপাকি পাওয়া গেল। শংকর ঘোষাল নির্বাচিত হয়েছে। যে গোলমালটুকু শংকর ক'রে ফেলেছিল প্রজ্ঞানারায়ণবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা ব'লে হরেনবাবু ঠিক ক'রে নিয়েছেন সেটুকু।

খবরের কাগজে একটা জব্বর খবরও চোখে পড়ল সবাই-

কার। প্রায় আধ কলম ধ'রে ছাপা হয়েছে খবরটা। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, মেয়র, ডেপুটি মেয়র, দুইজন অল্ডারম্যান ও কতিপয় কাউন্সিলারের অনুরোধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত মিশরে একটি দল পাঠাইবার কথা স্থির করিয়াছেন। এই দলটি অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে যাত্রা করিবে। পিরামিডের মাথা হইতে একটি সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোককে নামাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যেই দলটি যাইবে। লোকটি সম্বন্ধে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা অতীব বিস্ময়কর। সে নাকি প্রায় চৌদ্দটি ভাষায় গান গায় ও দিনে নিয়মিত শ'পাঁচেক ফুচকা, আড়াই মণ হজমি ও সাড়ে-তিরিশ-সের কড়া চিনেবাদাম ভাজা খাইয়া থাকে।

আরো জানা গিয়াছে, অভিযাত্রী দলটির দলপতি প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের একটি স্কুল বালক। তাহার নাম শংকর ঘোষাল। তাহার বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর। উচ্চতায় সে চার-ফুট আট-ইঞ্চি মাত্র। সুখের কথা, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় পাঁচ শত স্কুল বালকের মধ্য হইতে সে নির্বাচিত হইয়াছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে, যে প্রধানমন্ত্রী, কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কয়েকটি প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী, বিধানসভা ও লোকসভার কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের অনুপস্থিতিতে, লোকসভা ও বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন সমূহ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকিবে। সে-কারণে ভাষা সমস্যা খাদ্য সমস্যা ইত্যাদি অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কিত সব আলোচনাই আপাতত মুলতুবি রাখা হইবে। কারণ শারদীয়া পূজার মাত্র কয়েকদিন পরই বিশেষ অধিবেশনের কথা স্থির হয়।

খবরটা যে সময় মতো বেরুবে এ কথা হরেনবাবুর সঠিক জানা ছিল। শংকরকে তিনি বলেছেন এ খবরটা ছেপে বেরুবার পর ধ'রে নিতে হবে, এতে শুধু হরেনবাবুর একারই উৎসাহ নেই, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উৎসাহ তাঁরই মতো, কিংবা তাঁরও চেয়ে বেশি। তার মানে এ থেকে বোঝা যাবে পিরামিডের মাথার ওপর থেকে লোকটাকে নামিয়ে আনতে পারলে মথুরানাথ বিদ্যাপীঠের হরেনবাবু যত খুশি হবেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তার চেয়ে কম খুশি হবেন না।

সবাই খুশি হওয়ার মতো এত বড় একটা ঘটনা ঘটলেও, শংকরের বাবা কিন্তু খুশি হতে পারলেন না।

চা খেতে খেতে খবরের কাগজের পাতা উলটিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। আজকের কাগজের সব চেয়ে বড় খবরটা যত ছোট হরফেই ছাপা হোক, চোখে পড়বেই। প্রথমটা বিশ্বাসই হয় না। পরে যখন দেখলেন হুবহু সব মিলে যাচ্ছে, মায় বয়স আর উচ্চতা পর্যন্ত, তাঁর হাত থেকে কাগজখানা খ'সে প'ড়ে গেল। শংকরকে ডাকলেন।

—হ্যাঁরে শংকর, খবরটা সত্যি নাকি রে ?

—কোন খবর বাবা ?

খবরটা যেখানে বেরিয়েছে সে জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। চোখ পড়া মাত্র শংকর এক নিশ্বাসে প'ড়ে ফেলে। আনন্দে গলা ধ'রে আসে ; বলে, একেবারে খাঁটি খবর। শংকরের বাবা সঙ্গে সঙ্গে শংকরের মা-কে ডাকেন, বলেন, কাণ্ড দেখেছ তোমার ছেলের !

—হ্যাঁ, তোমার কলমের মাথাটা হারিয়ে ফেলেছে কোথায়—

—আরে না না, কলমের মাথা কেন—ব'লে শংকরের বাবা

খবরটা প'ড়ে শোনালেন। শুনে তো তার মা কেঁদে-কেটে এক-সার। কান্না শুনে তার বাবা আরো ঘাবড়ে গেলেন। শংকর ভাবল হয়েছে আমার মিশরে যাওয়া।

এমনি সময় তাদের বাড়িতে দরজায় কড়া ন'ড়ে উঠল। আর দেখতে দেখতে ভেতরে এসে হাজির হলেন হরেনবাবু। শংকরের বাবাকে তিনি বোঝালেন, তেনজিং নোরকে কে বিট্‌ করতে পারে একমাত্র শংকর। এ সুযোগ তাঁদের দেওয়া উচিত শংকরকে। শংকরের বাবা যদিও বা বুঝলেন, শংকরের মা তো কিছুতেই রাজী নন। যদিও বা শেষ পর্যন্ত অনেক ক'রে তাঁকে বোঝানো গেল, শংকরের ছোট বোন মিঠু তো হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

একটা মনুমেণ্টে উঠতে শংকর আর মিঠুর একবার হাত-পা ঢুকে গিয়েছিল পেটের মধ্যে আর এখন তার দাদা সাড়ে-তিনটে মনুমেণ্টের মতো উঁচু মই বেয়ে উঠবে! হরেনবাবু তাকেও বুঝিয়ে বললেন, কিছু ভয় নেই মিঠু। ছাখ না, তোমার দাদা একবার লোকটাকে কলকাতায় নিয়ে আসুক, তারপর কী মজা হয়। এতটুকু লোকটা তোমার সামনে বসে গপগপ ক'রে পাঁচশো ফুচকা, আড়াই মণ হজমি···খাবে।

অভিযান

পুজোর ঠিক কয়েকটা দিন আগেই শংকর দলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বোকাদা, অমল বা তিমির কারো যেন এখনো ব্যাপারটাকে সত্যি ব'লে বোধ হচ্ছে না। চার-ফুট আট-ইঞ্চি শংকর ঘোষাল প্রধানমন্ত্রী, লোকসভা আর আইনসভার বড় বড় সদস্যদের সঙ্গে মিশর যাচ্ছে—এও কি কোনোদিন সত্যি হতে পারে। কিন্তু তাই হল'। সবাইকার চোখের সামনে দিয়ে নাকের ওপর তুড়ি মেরে শংকর যথাসময়ে দিল্লী চ'লে গেল। শংকরের দেখাশোনার জন্যে সঙ্গে হরেনবাবুও গেলেন। কারণ শংকরের মাকে ভরসা দিয়েছেন, তিনি সঙ্গে থাকবেন।

পালাম বিমান বন্দরে সে কী হৈ-রৈ ব্যাপার!

একদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, মেয়র, ডেপুটি মেয়র

এঁরা সব, অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, অনেক নামকরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, লোকসভার জঁাদরেল সভ্যদের কেউ কেউ। এ ছাড়া নানা প্রদেশের বাংলা ইংরেজী কাগজের নিজস্ব প্রতিনিধিদের অনেকে, আর সব বড় নামকরা ফোটোগ্রাফার জনকয়েক।

দরকারি জিনিস-পত্তর যা যা নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সব চেয়ে দরকারি হল লালদিঘীর মতো বড় মস্ত একখানা জাল। মাছ তো দূরের কথা, সে জালের ফাঁক দিয়ে মাছি মশা গলতে পারে না। আর সাড়ে-তিনটে মনুমেণ্টের মতো উঁচু একখানা মই। প্রধানমন্ত্রী মেয়র ডেপুটি মেয়রের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তৈরী করিয়েছেন। তিন পাটে ভঁাজ ক'রে একটা লোহার সুটকেসের মধ্যে ভাল ক'রে রাখা হয়েছে।

পালাম বিমান বন্দরে অভিযাত্রী দলটিকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে সে কী প্রচণ্ড ভিড়। শংকরের বাবা মা আর ছোট বোন মিঠুও উপস্থিত ছিল। মিঠু বিমান ছাড়বার আগে রুমাল নেড়ে নেড়ে দাদাকে বিদায় জানালো। শংকরের গলায় ফুলের মালা। শুধু দেখল মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। ভাবল, মা-টা, বড় ভীতু। আর ভাবল, বোকাদা, তিমিরবরণ কিম্বা অমলশংকর একবার দমদম পর্যন্তও তো আসতে পারত।

প্রকাণ্ড একটা বাজপাখির মতো দু'টো বিরাট ডানা মেলে বিমানখানা মাটি ছেড়ে শূন্যে উড়ল। তারপরে শূন্যে ভেসে চলল বাতাসের ঢেউ ঠেলে ঠেলে।

শংকর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আবার স্বপ্ন দেখল। সে দেখল বিমানখানা নীলনদের মাথার ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। আর ঠিক নিচে জলের ওপর রানী ক্লিওপেট্রার সেই ময়ূরপঙ্খী বজরা।

রানী ক্লিওপেট্রা ওপর দিকে মাথা তুলে গায়ের তারা-ফুল দেওয়া রঙীন ওড়নাখানা ওড়াচ্ছেন। আর সে বিমান থেকে জানলার মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে কি যেন বলার চেষ্টা করছে তাঁকে, মুখের একটা পাশ হাত দিয়ে ঢেকে। ক্লিওপেট্রার গলার স্বর শুনতে পেল সে। তিনি বলছেন, যাক তুমি এসে পড়েছ সত্যি সত্যি।

সে প্রাণপণ চেঁচিয়ে বলতে গেল, না আমি একা নই। আমরা দলবল সবশুদ্ধ এসে পড়েছি।

ঠিক এমনি সময় তার ঘুম ভেঙে গেল। দেখল সে ঘেমে উঠেছে। আর হরেনবাবু তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলছেন, কী রে ভয় পেয়েছিস নাকি?

—না স্যার, লজ্জা পেয়ে শংকর বলল। তার একবার ইচ্ছে করল জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিচে নীলনদের ওপর সত্যিই রানী ক্লিওপেট্রার বজরা ভাসছে কিনা।

—এর মধ্যে ভয় পেলে চলবে না। এখন মনে খালি সাহস আনা দরকার, সাহস দেওয়ার মতো ক'রে বলেন হরেনবাবু।

আর সব কারা কে কি করছেন শংকর চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে একবার আড় চোখে দেখে নিল।

সে দেখল পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী কোলের ওপর মোটা একখানা বই খুলে রেখে,চোখ বুজে ঢুলছেন। অন্য এক দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী একগাদা কাগজ-পত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। আর মাঝে মাঝে জানলার বাইরে চোখ মেলে দেখছেন। খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে তাঁকে। লোকসভা আর বিধানসভার জরুরী আলোচনাগুলো সব মুলতবি রাখা হয়েছে, এই জন্যেই বোধ হয় মনটা ভাল নেই। লোকসভার একজন সদস্য চোখে

কালো চশমা আঁটা, অনেক দিনের পুরোনো খবরের কাগজ এক পাশে জড় করেছেন। কাগজ দেখছেন কি ঘুমুচ্ছেন, বোঝবার কোনো উপায় নেই। তাকিয়ে থাকতে থাকতে শংকর লক্ষ্য করল, হঠাৎ তিনি একপাশে টলে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন নিজেকে। শংকরের হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু মুখে হাত চেপে ধ'রে জোর ক'রে হাসি চাপল। বুঝতে পারল তিনি আসলে ঢুলছিলেন।

এবার শংকরের চোখ পড়ল ফোটোগ্রাফারদের ওপর। পাকা ক্যামেরাম্যান এক এক জন। উড়োজাহাজের ওপর থেকে কত কায়দায় নিচের ছবি তোলা যায় তারই কথা ভাবছেন। একজন বিমানের ভিতরকার খানকয়েক ছবি তুলে ফেললেন। ডান-হাত বাঁ-হাত দুই-ই যাঁদের সমান চলে, সেই সব ধুরন্ধর রিপোর্টাররা বিমানের ভেতরে কে কী করছেন তার রিপোর্ট তৈরী করছেন।

সে দেখল হরেনবাবু নিজের জায়গায় ব'সে এবার তাঁর জিওগ্র্যাফি বই-এর প্রুফ দেখছেন। বই ছাপা আরম্ভ হওয়ার ক'টা দিন পরই হরেনবাবুকে কলকাতা ছেড়ে চ'লে আসতে হল। সে মনে মনে মা কালীর নাম করতে লাগল। যে বুড়ো লোকটা তাদের বাড়ি গান গেয়ে পয়সা চাইতে আসে, তার বানানো গানটা মনে প'ড়ে গেল :

তোমার দয়া অসীম মাগো জগৎ জুড়ে জানাজানি
কালীঘাটে কালী তুমি, ভবানীপুরে মা ভবানী।

কালী নাম জপ করবার পর সে ছোট বোন মিঠুর নতুন গল্পের বইখানা খুলে পড়তে শুরু করল। বুড়োবুড়ির হুড়োহুড়ি বইখানা মিঠু দাদাকে আসবার সময় দিয়েছিল।

শংকরদের বিমানখানা গিয়ে থামল একেবারে নীলনদের পশ্চিম তীরে, চারশো একাশি ফুট উঁচু পিরামিডের দিকে মুখ ক'রে।

তারপর আরোহীদের এক এক ক'রে নামিয়ে জিনিস-পত্তর সব বিমান থেকে বাইরে বার ক'রে দিয়ে দেখতে দেখতে উড়োজাহাজখানা হু-উস্ ক'রে শূন্যে উড়ে গেল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, মেয়র ডেপুটি-মেয়রের যে কথা হয়েছে, সেই কথা মতো অভিযাত্রী দলকে পৌঁছে দিয়েই বিমানখানা ফিরে যাবে। তারপর আবার সময় মতো এসে গোটা দলটিকে নিয়ে যাবে। কত সময় লাগবে তা তো গোড়া থেকে কিছু বলা যায় না। দরকার হলে তিনমাসের জায়গায় ছ'মাসও লাগতে পারে। শুধু শুধু বিমান-খানা ডাঙায়-ওঠা কুমীরের মতো হাত-পা ছড়িয়ে রোদ্দুরে গা শুকোবে নাকি।

যাই হোক সঙ্গে সঙ্গে দলের হিসেব করা কুড়িজন জোয়ান লোক হাত লাগিয়ে পর পর গোটা আট-দশ তাঁবু খাটিয়ে ফেলল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জন্য আলদা তাঁবু একটা। তাঁর তো মাঝে মাঝে ছুটির দরকার। অনেক কাজের ভাবনা তাঁর মাথায়। নিরিবিলি সেই সব দরকারি কাজের কথা চিন্তা করবেন। তোড়-জোড় চলতে চলতেই তো এখন দিন দশ পনের। আসতে আর যেতে কতক্ষণ লাগে বিমানে। একটা রাত্তির ফরসা হবার আগেই বিমান তোমায় পৌঁছে দেবে, কলকাতা থেকে যত দূরই হোক। যত মুশকিল তো আসল কাজ নিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, মেয়র, ডেপুটি মেয়র একটা তাঁবুতে রইলেন। মেয়র ডেপুটি মেয়রের যত দরকারী আলোচনা সব পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হবে। আর কখন কী কথা আলোচনা তাই বা কে জানে।

অলডারম্যান কাউন্সিলাররা ঢুকলেন একটা তাঁবুতে। লোকসভা আইনসভার সদস্যরা রইলেন একটা তাঁবুতে। স্টাফ্ রিপোর্টাররা, স্টাফ্ ফোটোগ্রাফাররা গেলেন আরেক নম্বর তাঁবুতে।

হরেনবাবু, শংকর আর দু'জন ডাক্তার রইলেন আরেকটা তাঁবুতে। যতক্ষণ না মই খুলে ঠিক মতো জায়গা বেছে, পিরামিডের গায়ে হেলান দিয়ে লাগানো হয়, অর্থাৎ শংকর কাজে নামবার আগে পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত ডাক্তার দু'জন শংকরকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে যাবেন। পাল্‌স দেখবেন ঠিক ঠিক সময়ে। শংকরের হার্ট পরীক্ষা করবেন, শংকর নার্ভাস হয়ে পড়ছে কিনা লক্ষ্য রাখবেন।

আর গোটা চারেক বড় তাঁবু ফেলা হল ওই কুড়িজন জোয়ান লোকেদের জন্যে। জোয়ান মানে কি, প্রত্যেকের ওজন সাড়ে-চার মণ থেকে সাড়ে-পাঁচ মণের মধ্যে। তারা ভাল ক'রে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে প্রথম ক'টা দিন যা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে নেবে। তারপর মই খুলে উঁচু ক'রে তুলে যখন পিরামিডের পিঠে লাগাবার চেষ্টা করবে তখন তো তাদের মুখে মুখে জলের বালতি ধরবার দরকার হবে সব সময়। সে জন্যেও লোক আনা হয়েছে বিমানে ক'রে।

তাঁবু খাটাতে বেশিক্ষণ লাগল না। ভাল সময়ে এসে পৌঁছেছে শংকরদের বিমানখানা। যদিও তাঁবু খাটাতে খাটাতে

রোদ চ'ড়ে গেল, তবু বিকেলের দিকে সবাই নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে পারল। সত্যি কথা বলতে কি মিশরে পৌঁছে গিয়েও সেদিন আর কারো মাথায় সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার কথা একবারো এল না। শংকরের নিজের তো আর কথাই নেই। তার গায়ের ব্যথা তখনো তাকে ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে ঈশ্বরভক্তবাবুর ট্রেনিং-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

পরদিন সকালে স্টাফ্-ফোটোগ্রাফারদের মধ্যে একজন বাইনোকুলর দিয়ে ওপরের দিকে ঘাড় সোজা ক'রে চোখ তুলে অনেকক্ষণ কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন।

কয়েক মিনিট ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে·····

প্রধানমন্ত্রী সকালের চা খাওয়া শেষ ক'রে তাঁবুর বাইরে এসে কাজকর্ম কি ভাবে শুরু করা যায় বোধ হয় সে কথাই ভাবছিলেন। স্টাফ্ ফোটোগ্রাফারকে ওই ভাবে চোখের ওপর

বাইনোকুলর ঘোরাতে দেখে, তাঁর কৌতূহল হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী হে কিছু দেখতে-টেখতে পাচ্ছ নাকি ?

প্রধানমন্ত্রীর গলার স্বর শুনতে পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি চোখের ওপর থেকে ভারি পুরু লেন্‌সের দামি বাইনোকুলর নামালেন, বললেন, আজ্ঞে না, কিছুই তো আন্দাজ করতে পারছি না।

—কই দেখি, একবার তোমার দূরবীনটা, প্রধানমন্ত্রী তাঁর দিকে হাত বাড়ালে স্টাফ্‌-ফোটোগ্রাফার বাইনোকুলরটা এগিয়ে দেন।

কয়েক মিনিট ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে প্রধানমন্ত্রী সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার পর বললেন, না কিছুই তো চোখে পড়ে না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, কলকাতার মেয়র আর লোক-সভার দু'জন সদস্য কুড়িজন জোয়ান লোকদের পাঁচজনের সঙ্গে কি সব দরকারি কথা কইছেন। কোন জায়গা থেকে মইটা লাগানো যেতে পারে, কি রকম ভাবে লাগানো হবে। মাটির সঙ্গে যেন ভাল ক'রে লেগে থাকে মইটা। তলায় জাল ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকবে সবাই, তার জন্যে মইয়ের চার পাশ ঘিরে কতখানি জায়গা নেওয়া দরকার, সেই সব তদারক করছেন।

হরেনবাবু তাঁবু থেকে একবার বেরিয়ে পিরামিডের চার-পাশটা ঘুরে দেখে নিলেন। স্টাফ-ফোটোগ্রাফারদের একজনকে বললেন, তাঁদের তোলা পিরামিডের দু'-চারখানা ছবি যেন তিনি পান, তাঁর নতুন একখানা জিওগ্র্যাফির বইতে ব্যবহার কর-বেন। খুশি হয়ে স্টাফ-ফোটোগ্রাফার বললেন, নিশ্চয় নেবেন।

হরেনবাবু আবার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। জিও-

গ্র্যাফি বইয়ের প্রুফ দেখায় মন দিলেন। তাঁর দায়িত্ব কিছুই নেই, শুধু শংকরের অভিভাবক হয়ে দলের সঙ্গে আসা ছাড়া। শংকরকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন, গায়ের ব্যথা কমেছে তো? কেমন লাগছে কেমন? শংকর বলল, ভালই লাগছে স্যার, গায়ের ব্যথা এখন অনেক কম।

শংকর ভাবল প্রফুল্লবিকাশবাবুর লিস্টটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে। কিন্তু বুড়োবুড়ির হুড়োহুড়ি বইখানাও সে ছাড়তে পারছে না। খুব মজার বই। মিঠুকে ছোটমামা কিনে দিয়েছে। যেমনি ছবি তেমনি গল্প। পড়তে পড়তে সে যখন আর হাসি চাপতে না পেরে খিলখিল ক'রে হেসে উঠেছে, ঠিক সেই সময় তাদের তাঁবুতে এসে ঢুকলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে দেখে সে আর হরেনবাবু দু'জনেই এক সঙ্গে মাটির ওপর পা রেখে মাথা তুলে একেবারে সিধে। খেলার মাঠে ঈশ্বরভক্তবাবু ড্রিল করাবার সময় যেমন দাঁড়ায় আর কি।

প্রধানমন্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি, কী পড়ছ দেখি।

তার হাত থেকে বইখানা নিয়ে পাতা ওলটালেন। ছবি-গুলো দেখতে দেখতে মুচকি হাসলেন। তারপর হরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি এর আগেও আরো বই লিখেছেন। অর্থাৎ তিনি কি আরো অনেকগুলো বইয়ের অথর, মানে লেখক?

হরেনবাবু লজ্জা পেয়ে বইয়ের প্রুফ সব পকেটের মধ্যে পুরে রাখতে রাখতে বললেন, মাইনে তাঁদের এত কম যে ইচ্ছে না-থাকলেও এমন বই তাঁদের অনেক লিখতে হয়। প্রধানমন্ত্রী হরেনবাবুর কথায় মনে হল একটু দুঃখ পেলেন।

এই ক'রে দেখতে না দেখতে পাঁচটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল। শংকর দেখেছে এই এক মজা। কলকাতা ছেড়ে বিহারেই যাক, কিম্বা মিশরেই আসুক, বাইরে কোথাও গেলে দিনগুলো যেন দেখা দিয়েই এক মুহূর্তে কোথায় পালিয়ে যায়। এই সেদিন ক্যালেণ্ডারে দেখল দোসরা অক্টোবর তারা যাত্রা করেছে, আর আজ অমনি হয়ে গেল অক্টোবরের সাত তারিখ! কলকাতায় ইস্কুল থাকলে দিন তো কই এমন ক'রে কাটে না। নিখিলেশ্বরবাবুর সংস্কৃতর ক্লাসই মনে হবে পুরো একটা দিন।

এ ক'দিনে কুড়িজন জোয়ান লোক মিলে মই খুলে লাগাবার চেষ্টা করল। ভীষণ ভারী কিছু না-হলেও, অত উঁচু মই ঠিক মতো লাগানো তো সোজা কথা নয়। সোজা ক'রে তুলে ধ'রে রাখাই কি কমখানি কথা।

এই ভাবে আরো দু'টো দিন গেল।

ভাল কথা, এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপারও ঘটে গেল। মিশরের প্রেসিডেণ্ট একদিন প্রধানমন্ত্রীর তাঁবুতে দেখা করতে এলেন। বললেন, তাঁরা যে এ সময়ে এসে তাঁবু ফেলবেন সে খবর তো তাঁর কাছে আগেই পৌঁছেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা চুক্তির ব্যাপারে তাঁকে দেশের বাইরে যেতে হয়েছিল। তাই দেখা করতে দেরি হল। খুব খুশি হলেন তাঁকে দেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

সেই কুড়িজন জোয়ান লোকেদের একজন এসে হরেনবাবু আর শংকরকে ডেকে নিয়ে গেল প্রধানমন্ত্রীর তাঁবুতে। মিশরের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। হরেনবাবুর সঙ্গে আর শংকরের সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শংকরকে দেখিয়ে বললেন, আসলে এই হচ্ছে দলের হিরো।

তারপর হরেনবাবুর কাছ থেকে শংকর ওই সাড়ে-সাত-ইঞ্চি পিরামিডের লোকটার আরো অনেক কথা জানতে পারল। প্রধানমন্ত্রীর কাছে মিশরের প্রেসিডেণ্ট গল্প করেছেন।

লোকটা যে ঠিক কবে থেকে পিরামিডের মাথার ওপর এসে ব'সে আছে কেউ সঠিক বলতে পারে না। সম্প্রতি এক-জন একশো আটানব্বই বছরের লোক মিশরে মারা গেছেন। তিনি নাকি মারা যাবার আগে বলেছেন, খবরটা কতদূর সত্যি তাঁর পক্ষে জোর ক'রে বলা মুশকিল। তবে পিরামিড যখন তৈরী হচ্ছে তখন নাকি ওর পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ পিরামিডের মাথার ওপর ঘরবাড়ি বানাবার চেষ্টা করেছে, আর বানিয়েও ছিল। তবে ওখানে যে ও স্থায়ী বসবাস করছে এমন কোনো খবর তিনি সঠিক দিতে পারেন না। ওর পূর্বপুরুষদের বানানো ঘরবাড়ির এখন আর কোনো চিহ্ন নেই। ও নাকি কোনোদিনও অত ছোট ছিল না। একবার এক ফকিরের সঙ্গে আল্লা আছে কি নেই, এই তর্ক করতে গিয়ে সে বলেছে, কোথ্থাও আল্লা নেই। ফকির নাকি ছিল যাদুকর। আর তার আল্লায় বিশ্বাস ছিল খুব বেশি। সে ভীষণ রেগে তাকে সাড়ে-সাত-ইঞ্চির একটা মানুষ ক'রে দিয়েছিল। ফকিরের সঙ্গে একটা থলি ছিল। সেটা সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লম্বা। সেই থলির ভেতর পুরে ফেলবার জন্যে লোকটাকে সাড়ে-সাত-ইঞ্চি ক'রে দিয়ে-ছিল। তারপর থলি কেটে বেড়িয়ে পড়ে সে। আর ফকিরের যাদুমন্ত্রের একখানা মোটা বই আর একটা যাদুদণ্ড সে চুরি ক'রে প্রাণপণ দৌড় দেয়। অনেকের ধারণা ওই যাদুদণ্ডের

সাহায্যে সে সব চেয়ে উঁচু পিরামিডের মাথায় উঠতে পেরেছে। তারপর নাকি যেই তার মনে হয়েছে যাদুদণ্ডটা সঙ্গে থাকলে আবার আল্লার বিশ্বাস তার ওপর ভর করবে, সেইজন্যে সে ওপর থেকে ছুঁড়ে নিচে নীলনদের জলে ফেলে দেয় সেটাকে। আর যাদুমন্ত্রের বইখানার পাতা সে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে। অনেক দেশের অনেক জায়গায় সেই সব ছেঁড়া পাতাগুলো ছড়িয়ে পড়েছে। যারা যারা কুড়িয়ে পেয়েছে তারা তারা নাকি পৃথিবী বিখ্যাত যাদুকর হয়েছে। যাই হোক, এ সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা তিনি আর কিছু জানেন না।

তবে মিশরের প্রেসিডেণ্ট বললেন, তিনি একখানা উড়ো চিঠি পেয়েছেন সম্প্রতি লোকটির কাছ থেকে। সে জানিয়েছে, তার আর বেশি দিন এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। যদিও সে এশিয়া ছেড়ে ইউরোপে যেতে চায় না।

ক্যালকাটার নাম সে শুনেছে। আর ক্যালকাটা, অত বড় একটা সাহেবি জায়গা, যে স্রেফ ডালভাত খাওয়া মানুষদের বাংলা দেশেই তাও সে জানে।

সে জানে এই ক্যালকাটা একদিন ব্রিটিশদের ছিল। আর এখন ইণ্ডিয়ানদের। আর বাঙালীরা নাকি কম সাহসী নয়। খুব জোর লড়াই করেছে বাঙালী ছেলেরা সাহেবদের সঙ্গে। তারাও নাকি কম বীর নয়। তারাও দুমদাম বন্দুক চালাতে পারে। তাই তার ইচ্ছে একবার কলকাতা শহরে গিয়ে থাকা। বাংলা দেশের কোনো ছেলে যদি সাহস ক'রে মই বেয়ে উঠে তাকে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে তো সে খুশি হয়েই নিচে নেমে আসবে। ইণ্ডিয়ান হলেও চলবে; তবে যখন ক্যাল-কাটারই ব্যাপার, তখন কলকাতার কোনো বাঙালী ছেলে হলে

তো আর কথাই নেই। তবে ক্যালকাটার নাম যতই কলকাতা করো সাহেবি গন্ধটা সেই একটু থেকেই যায়।

খাওয়ার ব্যাপারে সঠিক কিছু কেন, কিছুই তিনি বলতে পারেন না। তবে ওই লোকটির কাছ থেকে উড়ো চিঠি পাওয়ার পর তার ইচ্ছে মতো তিনি হেলিকোপ্টারে পাঁচশো ফুচকা আড়াই মণ হজমি আর সাড়ে-তিরিশ সের কড়া চিনেবাদাম ভাজা পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

খবরটা তিনি পাওয়া মাত্র ইংরেজী সংবাদপত্রে ছাপার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এশিয়ার অনেক ইংরেজী কাগজে খবরটা যথা সময়ে বেরিয়েছে। যারা বিশ্বাস করে নি তারা ছাপে নি।

কলকাতার মেয়র যে এমন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করবেন, তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। খুব খুশি হয়েছেন তিনি এই ব্যবস্থায়। আর লোকটার যখন কলকাতায় থাকার এত বেশি ইচ্ছে। তা ছাড়া মেয়র ঠিকই ধরেছেন, কলকাতায় এখন ও একটা দর্শনীয় বস্তুই হবে বটে। যাই হোক, ভালয় ভালয় সব কিছু চুকে গেলে, দলটি নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারলে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবেন।

বিভিন্ন কাগজের নিজস্ব প্রতিনিধিরা সব টপাটপ তাঁবুর মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মিশরের প্রেসিডেন্টের সাক্ষাৎ-কারের বিবরণ তৈরী ক'রে 'ফেললেন। স্টাফ-ফোটোগ্রাফাররা দু'-এক খানা ছবিও তুলে নিলেন। এইসব খবর আগে পাঠানো হবে কলকাতায়, তারপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়। দলটি যে নির্বিঘ্নে মিশরে পৌঁছে মিশরের সব চেয়ে বড় পিরামিডের নিচে তাঁবু খাটিয়েছে, আর মিশরের প্রেসিডেন্ট সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটা সম্পর্কে এমন মজাদার ও দরকারি কথা জানিয়েছেন,

এ সব কিছুই কলকাতার বড় বড় বাংলা আর ইংরেজী কাগজে ছাপা হবে। ভাবতেই শংকরের মনটা আনন্দে একেবারে টই-টম্বুর। সে ভাবল, কলকাতায় ব'সে ব'সে বাবা, মা আর মিঠু যখন এ সব খবর পড়বে, তখন শংকরের কথা ভেবে তাদের কত গর্ব হবে।

আরো দিন তিনেক পর সত্যি সত্যিই সেই কুড়িজন দৈত্যের মতো জোয়ান লোকগুলো হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো ক'রে চব্বিশ-ঘণ্টা গলদঘর্ম হয়ে যুদ্ধ ক'রে পিরামিডের পিঠের ওপর সাড়ে-তিনটে মনুমেণ্টের মতো উঁচু মইখানা লাগালো।

ব্যাস! তারপর তো তারা ক'টা দিন চিৎপটাং। সেই যে কুড়িটা জোয়ান লোক নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল কার সাধ্য তাদের তোলে? শংকরের সত্যি সত্যি মনে হল কুড়িটা কুম্ভকর্ণ পাশাপাশি শুয়ে ঘুমের কম্‌পিটিশন লাগিয়েছে। মিঠু যদি একবার দৃশ্যটা দেখত!

শংকর লক্ষ্য করল একজন ফোটোগ্রাফার সত্যিই ওদের একখানা ফোটো নিলেন।

এবার তো আর শংকরের তাঁবুর মধ্যে শুয়ে শুয়ে বই পড়লে চলবে না। তাকে তো এবার উঠে তৈরী হয়ে নিতে হবে। তৈরী হওয়ার কথা যেই মনে হল শংকরের বুক ঢিপঢিপ শুরু হয়ে গেল।

—আচ্ছা, তুই বাইরে গিয়ে একবার দেখেই আয় না, কি মনে হয় তোর, হরেনবাবু সাহস দিয়ে, সস্নেহে ওর পিঠে হাত রেখে বলেন।

হরেনবাবুর কথামতো তাঁবুর বাইরে এল। কিন্তু বেরিয়ে

এসে আরেক বিপদ। ওপর দিকে চোখ তুলতেই তো তার মনে হল, তার মাথা তাকে ছেড়ে পিরামিডের মাথার ওপর গিয়ে উঠেছে। সর্বনাশ! মইটার মাথা তো দূরের কথা, মাঝপথই সে নজরে আনতে পারছে না। না, এ মই বেয়ে ওঠা একেবারেই অসম্ভব। শংকরের পা তো বটেই, সমস্ত শরীর কাঁপছিল। হরেনবাবু তাড়াতাড়ি ধ'রে ফেললেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, কলকাতার মেয়র, ডেপুটি মেয়র এঁরা সব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তবু ব্যাপারটা কি প্রথমে বুঝতে পারলেন না। পরে হরেনবাবুর মুখ থেকে যখন সব শুনলেন তখন রীতিমতো ঘাবড়িয়ে গেলেন। প্রধানমন্ত্রীর কানে আর কিছু তোলা হল না সেদিন। তিনি নিজের তাঁবুর মধ্যে বিশেষ অধিবেশনে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার কথা ছিল সেইগুলো নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করছিলেন।

পরদিনও শংকরের একই অবস্থা। প্রধানমন্ত্রীর কথায় যাতে শংকর মনে সাহস পায় সে জন্যে তাঁর তাঁবুতে খবর পাঠালেন মেয়র। আজও ব্যস্ত ছিলেন তিনি। তবু খবর পেয়ে এক দৌড়ে বেরিয়ে এলেন তাঁবুর ভিতর থেকে।

অনেকক্ষণ ধ'রে বোঝালেন তিনি, অনেক সাহস দিলেন, ভরসা দিলেন। কিন্তু কোনো ফল হল না। একজন ডাক্তার শংকরের পাল্‌স দেখলেন। দেখে বললেন, ওর তাঁবুতে ফিরে যাওয়াই ভাল।

সেই রাত্রে তাঁবুর মধ্যে শুয়ে শুয়ে শংকর ভাবল, না এ রকম ক'রে লোক হাসিয়ে কোনো লাভ নেই। এসে যখন পড়েছে, উঠতেই হবে। না উঠে কোনো উপায় নেই। এতদিন ধ'রে এই সব আয়োজন তার জন্যে সব ভেস্তে যাবে নাকি। আর

কা বা ভাববেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মাথার ঠিকই থাকবে না হয়তো।

তা ছাড়া কলকাতায় ফিরে গিয়ে শংকর আর মুখ দেখাতে পারবে কারো কাছে। বাবা, মা, ছোটবোন মিঠু হয়-তো তাকে কলকাতায় ফিরে আসতে দেখে এত তাড়াতাড়ি খুব খুশি হবে। কিন্তু বোকাদা, অমলশংকর বা তিমিরবরণের কাছে সে কি ক'রে ঘাড় সোজা ক'রে হাঁটবে। শংকর কোথা থেকে তাই মনে বাঘের মতো জোর পেল সেই রাত্রে তাঁবুর মধ্যে চোখ বুজে।

পরদিন সকালে উঠে শংকর আরেকবার মনে মনে মন্ত্রটা জপ ক'রে মা কালীকে স্মরণ করল :

তোমার দয়ার ছড়াছড়ি, মিশরবাসী জানে তাহা
ভবানীপুরে তাই ভবানী কালীঘাটে কালী যাহা

শংকর মনে কোথা থেকে যে এত জোর পেল নিজেও তা জানে না। ডাক্তার দু'জন শংকরকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে নিলেন। বললেন, তোমার হাত-পায়ে যথেষ্ট জোর আছে। শুধু তোমার মনের জোর দরকার। মনের জোর ছাড়া কেউ কোনো শক্ত কাজ করতে পারে না। মনে সব সময়ে জোর আনতে হবে।

শংকরকে তাঁরা মই বেয়ে ওপরে ওঠার আগে লজেঞ্চুসের মতো কতগুলো কি দিলেন। বললেন, মুখে রাখলে, তোমার ক্ষিদে তেষ্টা বেশি পাবে না। তা ছাড়া মনের বলও বাড়বে।

শংকরের পিঠের ওপর থেকে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে দেওয়া হল। যে রকম ব্যাগ সে স্কুলে যাবার সময় নিয়ে যায়। এর

মধ্যে এক সপ্তাহের খাবার, জল, দুধ এই সব পুরে দেওয়া হল। এর বেশি সময় লাগা উচিত নয়। যদি শংকর বোঝে দু'হপ্তার মতো লাগবে, তা হলে কম ক'রে খাবে; মুখে লজেঞ্চুসের মতো ট্যাবলেট রাখবে। তা হলেই খিদে কম লাগবে।

শংকরের কোমরে বেল্‌ট বেঁধে দেওয়া হল। ঘুম পেলে মইয়ের সঙ্গে কোমরের বেল্‌ট বেঁধে নেবে। তা হলে পড়ার আর কোনো ভয় থাকবে না।

মইয়ের গায়ে, ফুটের মাপ হিসাবে দাগ দেওয়া আছে। কতখানি উঠল সে তাও দাগ দেখে বুঝতে পারবে।

কতখানি উঠল, আরো কতখানি উঠতে হবে এ সব খবর নিচে পাঠাবার জন্যে শংকরের গলায় ছোট্ট একটা বেতার যন্ত্র ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তার সুবিধে অসুবিধে সব কথা, ছোট-খাটো যত দরকারি কথা—সব কিছুই সে সময় মতো জানাবে।

ঠিক হল সবাই রুটিন ক'রে লালদীঘির মতো বড় জাল-খানা ধ'রে থাকবে। হাত ব্যথা করলে এক-একজন ক'রে হাত বদল করবেন। তা ছাড়া ঘুম পেতেও পারে। জাল তো কোনো মতে ছাড়া চলবে না।

শংকর যখন মইটার প্রথম ধাপে পা রেখেছে তখন সবাই একদফা হাততালি দিলেন। শংকর লক্ষ্য করল জাল ধরবার জন্যে প্রথমেই এগিয়ে এলেন প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-মন্ত্রী, ডেপুটি মেয়র, অলডারম্যান দু'জন, লোকসভা আইনসভার বিশিষ্ট সদস্যরাও সব রেডি হয়েছেন।

মেয়রের গলাও সে শুনতে পেল। তিনি বললেন, আমি এক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি। তিনি একজন ফোটোগ্রাফারের

সঙ্গে কি কথা বলছিলেন। শংকর জানে সে উঠতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে ফোটো নেওয়া শুরু হবে। যতক্ষণ তাকে দেখা যাবে এক-একখানা ফোটো নেওয়া হবে।

এইবার শংকর সত্যি সত্যি উঠতে আরম্ভ করবে। প্রধান-মন্ত্রী এগিয়ে এসে তার কানে কানে বললেন, কোনো ভয় নেই তোমার, যদি সে রকম বেগতিক ছাখো, তো চোখ বুজে হাত-পা ছেড়ে দেবে। আমরা চব্বিশ ঘণ্টা জাল ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকব নিচে। মনে করবে খাটের ওপর থেকে মেঝের ওপর প'ড়ে যাচ্ছ ঘুমের ঘোরে।

তারপর তিনি শংকরের হাতে একখানা ধবধবে টেবিলক্লথ দিয়ে বললেন, এটা তোমার সঙ্গে রাখ। এটার এক কোণায় আঠা লাগানো আছে। লোকটার মেজাজ আগে ভাল ক'রে বুঝে নেবে। তারপর কাতাকুতু দেবে। হেসে যখন গড়াগড়ি দেবে লোকটা তখন এই আঠা-লাগানো কোণাটা তার পিঠের ওপর ছুঁড়ে দেবে। আটকে গেলে, তুমি তাকে জড়িয়ে নেবে এই কাপড়টায়। তারপর তোমার পকেটে পুরে নেবে। গুড লাক!

শংকর মিলিটারি কায়দায় প্রধানমন্ত্রীকে স্যালুট করল। সে দেখল হরেনবাবু এক পাশে দাঁড়িয়ে হাসছেন। তার সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই হরেনবাবু মাথার ওপর এক হাত তুলে তাকে শুভেচ্ছা জানালেন।

শংকর ওঠবার আগে বুক পকেটটা একবার দেখে নিল। বুলুর দাদার লেখা কাগজের টুকরোটা ঠিক আছে কিনা। দেখল ঠিক আছে।

তারপর সে একটা একটা ধাপ বেয়ে ওপর দিকে উঠতে লাগল।

শংকরের কানে ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দ গেল। বুঝতে পারল ফোটো নেওয়া শুরু হয়ে গেছে।

ফোটোগ্রাফারদের কাজই এখন সব চেয়ে বেশি। তাঁরা আর চোখের ওপর থেকে ক্যামেরা নামাতে পারছেন না। অদ্ভুত লাগছে বই কি! চারশো একাশি ফুট উঁচু মই বেয়ে একটি চোদ্দ বছরের ছেলে, উচ্চতায় যে মাত্র চার-ফুট আট-ইঞ্চি, টিকটিকির মতো দেয়াল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। ফিক ফিক ক'রে সব হেসে ফেলছেন।

প্রথম দু' চারখানা ছবিতে শংকরকে শংকর ব'লেই স্পষ্ট চেনা গেল। কেউ নিলেন পিছন থেকে, কেউ পাশ থেকে।

ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়বার পর যেমন আস্তে আস্তে দম নেয়, সেই রকম শংকরও প্রথম কয়েকটা ধাপ পার হবার পর গতি বাড়িয়ে দিল।

জাল ধ'রে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই সোজাসুজি চোখ ফেরালেন। আশ্চর্য! দেখতে না দেখতে শংকর এতখানি উঠে গেল। ভাল রানার হিসাবে শংকরের সুনাম আছে, সাইক্‌ল চালাতেও শংকর ওস্তাদ। কিন্তু মইয়ের ওপরও যে সে এমন তাড়াতাড়ি পা চালাতে পারে তা হরেনবাবুর আগে জানা ছিল না।

আর সবায়ের মতো হরেনবাবুও লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, শংকর মাথা উঁচু রেখে পাহাড়ে ওঠার মতন মইয়ের একটা ধাপ পেরিয়ে আরেকটা ধাপ বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠতে লাগল। কি জানি হরেনবাবুর একবার তেনজিং নোরকের কথা মনে প'ড়ে গেল। ঠিক এমনি সাহস ক'রে বোধ হয় তেনজিং এভারেস্টে উঠেছিল।

ফোটোগ্রাফাররা সবাই তৈরী ছিলেন। যতক্ষণ শংকরকে দেখা যাবে ততক্ষণ তাঁরা ছবি নিয়ে যাবেন।

এইবার মইয়ের ওপর নজর রাখতে রাখতে তাঁরা লক্ষ্য করলেন, শংকরকে সত্যি একটা টিকটিকির মতো মনে হচ্ছে। সেই অবস্থায় শংকরের একখানা ছবি তাঁরা নিলেন। ভারি মজার ব্যাপার।

প্রধানমন্ত্রী এক কাউন্সিলরের হাতে জাল ধরার ভার দিয়ে একজন ফোটোগ্রাফারের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সত্যিই তো। অনেক উঁচুতে উঠে গেছে শংকর। একটা টিকটিকির মতোই দেখাচ্ছে শংকরকে।

আরো কিছুক্ষণ গেল। নিচে যে দু'চারজন বেতার যন্ত্র ধ'রে বসেছিল, তারা উপর থেকে শংকরের গলা পেয়ে তাড়াতাড়ি মেয়রকে ডাকল। মেয়র জাল ধরার ভার একজনের হাতে দিয়ে তড়িঘড়ি ক'রে এসে দাঁড়ালেন। তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন শংকর বলছে নাকি, আড়াইশো ফিট উঁচুতে চ'লে এসেছি। নিচের লোকগুলোর মাথা মনে হচ্ছে কাজলকালির দোয়াতের মাথার মতন অনেকটা। প্রথম দিকটা খুব জোর দম নিয়ে উঠেছি। এখন মনে হচ্ছে ব'সে জিরিয়ে নিতে হবে। আর বেশিক্ষণ উঠতে পারব ব'লে মনে হচ্ছে না।

মেয়র সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রীকে ডাকলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ছুটে এলেন। মেয়র তাঁকে শংকরের সব কথা বললেন। তিনি তাড়াতাড়ি বেতারযন্ত্র তুলে নিলেন। শংকরকে বললেন, তুমি দরকার হলে বিশ্রাম ক'রে নাও। একদম ভয় পেয়ো না। এইবার প্রধানমন্ত্রী তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। তাঁর কথা মন দিয়ে শুনে নাও।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ডাকলেন,- স্যার, একবার এদিকে আসবেন। শংকর ঘোষালকে আপনার কিছু বলার দরকার এইবার। মনে হচ্ছে ও আবার একটু ঘাবড়িয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, ঠিক আছে, আমি দেখছি কী করা যায়। এখন নার্ভাস হলে চলবে কি ক'রে।

প্রধানমন্ত্রী বেতার যন্ত্র তুলে নিলেন। তারপর শংকরকে বললেন, তোমাকে যেমন উপদেশ দেওয়া হয়েছে সেই ভাবে কাজ করবে। মনে রেখ আমরা সব সময় চব্বিশ ঘণ্টা জাল ধ'রে নিচে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি পড়ার ভয় করো না একদম। যদি টায়ার্ড হয়ে যাও তো কোমরের বেল্‌ট মইয়ের সঙ্গে লাগিয়ে ঘুমিয়ে নিবে। আর মোটেই ভেব না তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। ডাক্তাররা তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটাই ঠিক জেন। মনে যদি জোর রাখতে পার তো কিছুতেই ক্লান্ত হবে না। সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটাকে নামিয়ে আনার আগে পর্যন্ত তোমার ডিউটি তো শেষ হবে না। তাই মনে রেখ, তোমার সামনে এখন পিরামিডের সব চেয়ে উঁচু মাথা ছাড়া আর কিছু নেই। গুড লাক।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শংকর রেডিয়োতে অনেকবার শুনেছে। গলার আওয়াজে সমস্ত রেডিয়ো যন্ত্রটা যেন গমগম করে। ছোটমামা আর বাবা শুনতে শুনতে চোখ বুজে কত তারিফ করেছে। এখন শংকরকে যে কথাগুলো বললেন তাতে একটা জোরালো বক্তৃতার কথাই মনে প'ড়ে গেল।

স্টাফ্-ফোটোগ্রাফারদের একজন এবার প্রধানমন্ত্রীকে ডাকলেন। তাঁর কাছে গিয়ে ক্যামেরার কাচের মধ্যে দিয়ে

চোখ লাগিয়ে তিনি যা দেখলেন তাতে আরো অবাক হয়ে গেলেন। শংকর ঘোষালকে এখন ঠিক একটা আরশোলার মতো মনে হচ্ছে। তিনি হাসতে হাসতে হরেনবাবুকে ডেকে বললেন, দেখে যান আপনার ছাত্রকে মশাই। হরেনবাবু এক ছুটে প্রধানমন্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। দেখে সত্যিই তাজ্জব বনে গেলেন। তাঁদের স্কুলের শংকর ঘোষালকে একটা আরশোলার মতই দেখাচ্ছে বটে! ধন্য শংকর, তুই ধন্য, অস্ফুট ভাবে বললেও তাঁর কণ্ঠস্বর প্রধানমন্ত্রীর কানে গেল।

হরেনবাবু, বুঝি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যাক, শংকর তবে বুঝি মুখ রাখল। তবু শেষ রক্ষা না-হলে কিছু বলা যায় না। হয়তো মাথায় ওঠবার আগেই হাত-পা ছেড়ে দিল শূন্যে। তার-পর ঝপ্ ক'রে এসে পড়ল নিচে জালের ওপর। আর এক-বার নিচে এসে পড়লে আর কি শংকর ওপরে উঠতে পারবে। সে মনের জোর কোথা থেকে পাবে শংকর। হরেনবাবু তাই দুর্গানাম জপলেন। হে মা তুমি আমাদের মুখ রক্ষে করো। শংকর যেন শেষকালে না আবার মইয়ের ওপর থেকে জালের ওপর লাফিয়ে পড়ে।

এরপর একজন ফোটোগ্রাফার শকংরের যে ছবি তুললেন তা থেকে তাকে একটা কালো বড় ডেঁয়ো পিঁপড়ে ব'লে মনে হয়। ফোটো নিতে নিতে ফোটোগ্রাফার নিজেই হেসে খুন।

কাছেই জাল ধ'রে দাঁড়িয়েছিলেন মেয়র। তিনি দৃশ্যটা দেখার লোভ সামলাতে পারলেন না। জালের যে অংশটুকু তিনি নিজে ধরেছিলেন সেটা দলের একজনের হাতে দিয়ে তিনি এক-লাফে ছুটে এলেন ফোটোগ্রাফারের পাশে। বললেন এমন ভাবে যে কিছু একটা জানবার জন্যে তাঁর মন ছটফট করছে।

—কী ব্যাপার মশাই, এত হাসছেন ?

—দেখুন দেখুন একবার, ফোটোগ্রাফার ক্যামেরার চোখ কলকাতার মেয়রের চোখে লাগিয়ে দেন।
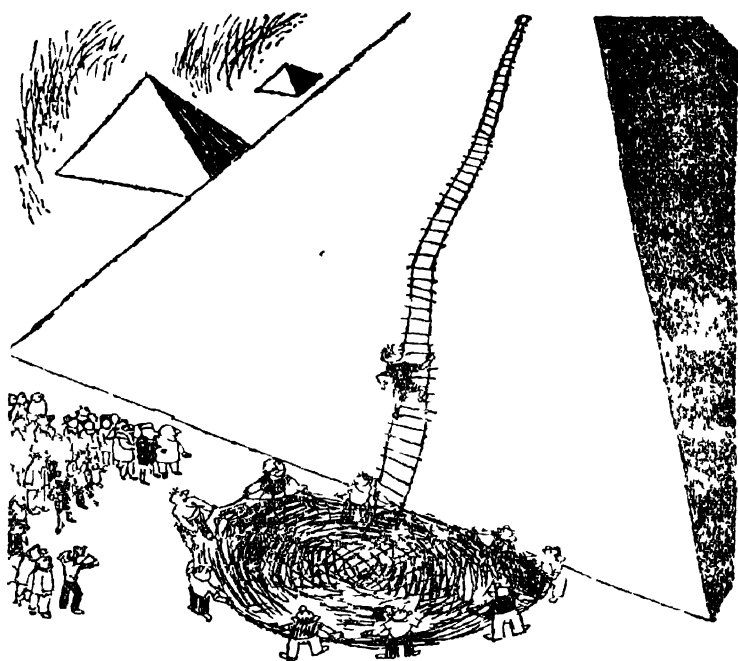
শংকর মই বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

দেখে তো মেয়র মশায়ের চক্ষুস্থির। চার-ফুট আট-ইঞ্চি শংকর ঘোষালকে চিনির কৌটোর ওপর ঘুর-ঘুর-করা একটা বড় কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে। তা হলে তো সত্যিই শংকর অনেক উঁচুতে পৌঁছেছে। যাক তা হলে বোধ হয় শংকর মেরে দিল।

৭

—সবাইকার মাথায় ওই এক ভাবনা। শংকর শেষ পর্যন্ত পিরামিডের মাথায় গিয়ে উঠল কিনা।

এই ভাবে সবাই ভাবনা চিন্তায় অস্থির হয়ে প্রায় রাত তিনটে পর্যন্ত ঠায় জাল ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। সবাইকার ঘাড় সিধে আর চোখ ওপরের দিকে। সবাই থেকে থেকে হাত বদল করলেন।

প্রধানমন্ত্রী একটু ছাড়া পেয়ে যারা বেতারযন্ত্র ধ'রে ছিল তাদের কাছে এলেন। ভাবলেন অনেকক্ষণ শংকরের কোনো খবর নেওয়া হয় নি। একবার একটা খোঁজ ক'রে দেখা যাক।

বেতারযন্ত্রে মুখ লাগিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বার বার শংকরের নাম ধ'রে ডাকতে লাগলেন। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। কিন্তু কানের কাছে ও শব্দটা কিসের? তাই তো খেয়ালই হয় নি তাঁর। পরিষ্কার নাক ডাকার শব্দ আসছে। শংকর রীতিমতো ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমুচ্ছে।

তিনি ভাবলেন, এই সেরেছে! ঘুমবার আগে শংকর নিজেকে মইয়ের সঙ্গে ভাল ক'রে বেল্ট দিয়ে বেঁধে নিয়েছে তো। না শেষকালে হঠাৎ ঝড়ে তালপড়ার মতো ঝপ ক'রে এসে পড়বে জালের ওপর।

শংকরের নাক ডাকার আওয়াজে মনে হয় ভোর হওয়ার আগে তার ঘুম ভাঙছে না। কি আর করবেন তিনি। আবার নিজের জায়গায় এসে জাল ধ'রে দাঁড়ালেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে খবরটা চারিদিকে গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আর সকলের মুখে কেমন আশঙ্কা আর আতঙ্কের ছায়া।

সবাই তাই ভাল ক'রে চোখ রগড়ে নিয়ে শক্ত হাতে জাল

ধরলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে ঢুলছিলেন। ডেপুটি মেয়র একটু ঠ্যালা দিয়ে তাঁকে সজাগ ক'রে দিলেন।

যখন ভোর হয়ে হয়ে আসে প্রায় তখন আবার শংকরের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রধানমন্ত্রী হাত বদল ক'রে আবার বেতারযন্ত্রের কাছে এসে দাঁড়ালেন। সত্যিই গলা পাওয়া গেল শংকরের। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি।

শংকরকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী হে কেমন ঘুম হল? কত দূর উঠলে? শংকর জবাব দিল, কাল রাত্তিরে খুব ভাল ঘুম হয়েছে। শরীরটা তাজা লাগছে। সাড়ে-তিনশো ফুট উঁচুতে চ'লে এসেছি মনে হচ্ছে।

—মাথার ওপর কাউকে দেখতে পাচ্ছ? প্রধানমন্ত্রী আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

—না এখনো কিছু হদিশ পাচ্ছি না। দেখি, আরো খানিকটা উঠে। এখন উঠতে বেশ ভালই লাগবে মনে হয়।

এই মরেছে! এখনো কিছু হদিশ পাচ্ছে না। তবে? লোকটা কি ওখান থেকে পালিয়ে গেল নাকি? না উড়ে গেল? ও লোকের কাছে কিছুই অসাধ্য নয়।

শংকরের মনের এখন যা তাজা ভাব তাতে শংকর ওপরেই উঠে যাবে। এমন কি নিচ থেকে যদি খবরও পাঠানো হয়, সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটা আর ওখানে নেই, তবু শংকর কানেই তুলবে না সে কথা। নিজে চোখে দেখে আসবে, আছে কি নেই।

তারপরও গেল ঘণ্টাখানেক। আকাশ বেশ ফরসা হয়ে এসেছে। চারিপাশ সকালের আলোয় পরিষ্কার স্বচ্ছ। নীল-নদের জল ভোরের আলোয় এখন কেমন শান্ত আর সুনীল মনে হচ্ছে।

সারা রাত ঠায় মই ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকার পর হাত-পা অনেকেরই টন্ টন্ করছে। মস্ত বড় বড় হাই তুলছেন ডেপুটি মেয়র, অলডারম্যানদের একজন আর দু'জন কাউন্সিলার। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর ভোর হলেই আবার ডবল-হাফ চা দরকার। আর প্রধানমন্ত্রী এক কাপ ভাল কফি মৌজ ক'রে না খেলে সারা দিনে কোনো কাজে মনই দিতে পারবেন না। হরেনবাবুর অনেক দিনের অভ্যেস খুব কড়া চা, প্রায় দুধ ছাড়া খুব কম চিনি দিয়ে এক কাপ চা। যে যাঁর অভ্যেস মতো চা আর কফি খেয়ে নিলেন। হাত বদল করলেও তো বিশ্রাম সেই সামান্য ক'টি মিনিট। একজন বিশ্রাম নিলে তো আর চলবে না। এতগুলো লোকের দম নেওয়ার ব্যাপার।

তাঁবু থেকে কফির কাপ রেখে সবে বেরিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, এমনি সময় বেতারযন্ত্রের কাছে ডাক পড়ল। জাল ধরবার জন্যে জালের দিকেই এগুচ্ছিলেন তিনি। দুপুরবেলার দিকে সেই যে চোখে কালো চশমা এঁটেছিলেন তা মাঝরাতে খুলেছিলেন। আজ আবার ভোর না-হতেই চোখে চশমা এঁটেছেন। তাই বেতারযন্ত্র যারা ধরেছিল তারা প্রথমটা বুঝতে পারল না তিনি তাদেরই দিকে আসছেন কিনা।

আবার ডাকতে যাচ্ছিল তারা প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু তিনি সজাগ। এক ডাকেই ঠিক শুনতে পান। তাই বেতারযন্ত্রের কাছেই চ'লে এলেন।

কানে ধ'রেই শংকরের গলা শুনতে পেলেন। শংকর বলছে সে সূর্য দেখতে পাচ্ছে। চমৎকার গোল সোনার চাটুর মতো সূর্য। পিরামিডের মাথাটা এবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বাতাস খুব ঠাণ্ডা। আকাশ ঝকঝকে। আর পিরামিডের

খসখসে মাথাটা মনে হচ্ছে আকাশ ছিঁড়ে সূর্যের কাছে চ'লে গেছে।

—তুমি তো সূর্য দেখতে পাচ্ছ, আর আমাদের এদিকে সূর্যের নামগন্ধ নেই। ভাল কথা, লোকটার কথা তো কিছু জানালে না? ব্যস্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন।

—লোকটার এখনো কোনো হদিশ পাচ্ছি না। তবে মোটে সাড়ে-সাত-ইঞ্চি তো, চোখে চট ক'রে নাও পড়তে পারে, শংকরের কথায় তবু কিছুমাত্র ভরসা পেলেন না। বরং একটু ঘাবড়িয়েই গেলেন। কিছু বিশ্বাস নেই ওই লোকটাকে। যে পাঁচশো ফুচকা, আড়াই মণ হজমি আর সাড়ে-তিরিশ-সের কড়া চিনেবাদাম ভাজা খেতে পারে, তার কাছে অসাধ্য কিচ্ছুটি নেই।

—আচ্ছা, তুমি এখন কত উঁচুতে, আবার প্রধানমন্ত্রীর ব্যস্ত গলা শুনতে পেল শংকর।

—দাঁড়ান, ভাল ক'রে দেখে নিই। হ্যাঁ, আমি চারশো ফিট উঁচুতে চ'লে এসেছি। প্রধানমন্ত্রীর মুখের অবস্থা দেখে অন্যরা সব ভাবনায় পড়লেন। প্রধানমন্ত্রী আবার নিজের জায়-গায় ফিরে এসে যখন জাল ধরলেন, তখন হরেনবাবু আর থাকতে না পেরে জাল ধরার ভার একজন কাউন্সিলারের হাতে দিয়ে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে এলেন, চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার স্যার?

প্রধানমন্ত্রী কেমন একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করলেন, তারপর খুব দুর্ভাবনা নিয়ে যেন বললেন, লোকটার তো কোনো টিকিই নেই!

খবরটা পাওয়া মাত্র হরেনবাবুর মুখটাও কেমন হয়ে গেল। তিনিই প্রথম খবরটা দিয়েছেন শংকরকে, আর জোর গলায়

দিয়েছেন। কি লজ্জার কথা! শংকর তো মাথার ওপর উঠবেই আর উঠে যদি দেখে সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটা নেই, তা হলে তো আর দেখতে হবে না। শংকর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না। আর সেই ভয়ে হয়তো ওপর থেকে নামতেই চাইবে না। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর কলকাতার মেয়র না তাঁকেই ধ'রে বসেন ওপরে উঠে শংকরকে নামিয়ে আনার জন্যে।

সত্যিই তো মহা ভাবনার কথা হল।

শংকর এদিকে মুখে লজেঞ্চুসের মতো ট্যাবলেট ফেলে নতুন ক'রে দম নিয়ে আরো খানিকটা ওপরে উঠে গেছে। সকাল ন'টায় শংকরের বাবা ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ আর খবরের কাগজ নিয়ে বসেন। তার মনে হল বাবা এতক্ষণে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কাগজে তার ছবি দেখছে, আর এই অভিযানের খবর পড়ছে। ভেবে তার মজা হল খুব, সে গর্ব বোধ করল।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল কি যেন একটা পিড়ামিডের মাথার ওপর থেকে বাইরে লেজের মতো বার করল, তারপর আবার স'রে গেল। শংকর খুব কড়া নজর রাখল। এবার দ্যাখে আবার কি একটা যেন মাথা বাড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকল, তারপর সেই একই ভাবে স'রে গেল।

তাই তো বেশ আশার কথা মনে হচ্ছে।

শংকর আরো গতি বাড়িয়ে দিল। এতক্ষণে সত্যিকার উৎসাহ পেল সে।

এত তাড়াতাড়ি উঠছে শংকর খেয়ালই রাখতে পারে নি কতখানি এল। সে মই বেয়ে উঠছে না তো ফাঁকা মাঠে

দৌড়চ্ছে। খেলার মাঠে শেষ মুহূর্তে গোল দেবার জন্যে সে যেমন প্রাণপণে মরিয়া হয়ে ওঠে, এখন যেন সেই অবস্থা।

খুব হাঁফিয়ে পড়লে শংকর মইয়ের ওপর বসে। একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে যেই ওপর দিকে চোখ তুলেছে, দেখে বেজির মতো কি একটা যেন বার বার মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখার চেষ্টা করছে। তারপর আবার মাথাটা সরিয়ে নিচ্ছে।

শংকর এবার নিশ্চন্ত হল। পিরামিডের মাথার ওপরে বেজি কি ইঁদুর ব'সে থাকবে হতেই পারে না। এ সেই সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোক না হয়ে যায় না।

সে এইবার একটা খবর পাঠানো দরকার মনে করল।

শংকর খবর পাঠাচ্ছে শুনে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী তাড়-তাড়ি বেতারযন্ত্রের কাছে এলেন।

—কিহে কী খবর তোমার? নতুন কোনো খবর আছে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মনে হচ্ছে লোকটাই হবে। পিরামিডের মাথার ওপর না হলে বেজি কি ইঁদুর উঠবে কি ক'রে?

—কেন বেজি বলছ কেন? জিজ্ঞাসা করবার সময় হেসে ফেললেন মন্ত্রী মশাই।

—ঠিক বেজির মতো ঘুরঘুর ক'রে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল কিনা।

—দ্যাখো দ্যাখো, ভাল ক'রে দ্যাখো। লোকটার খোঁজ পেতেই হবে, আর নামিয়েও আনতে হবে।

এক জন কাউন্সিলার অনেকক্ষণ ধ'রে শংকরের গলার স্বর শোনবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফুরসৎ

পাচ্ছিলেন না। ভীষণ চটে গেছেন তিনি কুড়িজন জোয়ান লোকের ওপর। রেগে-মেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, কী ভেবেছে কি ব্যাটারা! সেই যে মাটিতে পড়েছে আর ওঠবার নামগন্ধ নেই! আমরা কি মানুষ নই। না আমাদের কাঠের হাত-পা?

মেয়রের অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী তাদের কয়েকজনের গায়ে ঠ্যালা দিয়ে বললেন, ওহে তোমরা এবার সোজা হও একটু। তোমাদের ঘুমের চোটে যে দলের অনেকের মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর গলার আওয়াজ শুনে কয়েকজন তো ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। জোয়ান লোকদের একজনের হাতে জাল-ধরার ভার দিয়ে সেই কাউন্সিলার ভদ্রলোক বেতারযন্ত্রের কাছে কোনোক্রমে পৌঁছে যেই শংকরের গলা শোনবার জন্যে কান খাড়া করেছেন, অমনি শুনতে পেলেন শংকর বলছে, আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই, শিগ্‌গির তাঁকে পাঠিয়ে দিন।

কাউন্সিলার বুঝলেন তাঁর এখন কথা বলার বিশেষ সুবিধে হবে না। খুব জরুরী ব্যাপার নিশ্চয়। না হলে এমন চেঁচিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে দিতে বলবে কেন?

ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে খবর পাঠালেন।

এখন বেলা দশটা বেজে গেছে। প্রায় সাড়ে-দশটা। কাল সারা রাত্তির ধ'রে জাল ধরবার পর তাঁর কাঁধ দু'টো বন্‌কন্‌ করছিল। তিনি তাঁবুতে ব'সে এক কাপ তৈরী-করা দুধ খাচ্ছিলেন গরম গরম। খবর পাওয়া মাত্র দুধের কাপ নামিয়ে রেখে তিনি ছুটলেন বেতারযন্ত্রের কাছে।

—কী খবর শংকর বলো? প্রধানমন্ত্রীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শংকরের কানে গেল।

—আজ্ঞে খুব ভাল খবর। আমি মাথার ওপরেই প্রায় উঠে এসেছি। লোকটা আমার চোখের সামনেই ব'সে আছে। অনেকটা যেন নমাজ পড়ার ভঙ্গি। আমি একেবারে ওপরে উঠে বসবার পর আপনাকে আস্তে আস্তে সব খবর পাঠাবো। আপনি আরো ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা ক'রে থাকুন।

এ খবর পাওয়া মাত্র তো প্রধানমন্ত্রীর মুখ চোখ খুশিতে একেবারে ঝিকিমিকিয়ে উঠল। চারিপাশে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল, শংকর ঘোষাল চারশো-পঁচাত্তর ফিট উঁচুতে উঠেছে এবং সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার দেখাও পেয়েছে।

খুশির ধাক্কায় কেউ যেন আবার, জাল ছেড়ে না দিয়ে ব'সে থাকে। প্রধানমন্ত্রী সে বিষয়ে সবাইকে ভাল ক'রে সতর্ক ক'রে দিলেন।

যাই হোক খবরটা পাওয়ার পর সমস্ত দলটার মেজাজই যেন পালটিয়ে গেল। আর সব চেয়ে বেশি নিশ্চিন্ত হলেন হরেনবাবু।

শংকর তো প্রায় উঠেই এসেছিল, এবার এক্কেবারে মাথার ওপর এসে পা রাখল।

দেখল সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটা নাকের ডগার ওপর একটা ফুচকা রেখে টেনে টেনে গন্ধ নিচ্ছে। তারপরে সেটাকে দু' আঙুলে ধ'রে চোখের সামনে ঘোরাতে লাগল। একটা ফুচকা নয়তো, যেন বাগবাজারের একটা নরম তুলতুলে রসগোল্লা। তারপর মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে এমন ভাবে চিবতে

লাগল যে এর চেয়ে ভাল খাবার আর কিছু তুনিয়ায় নেই।

শংকর যে পিরামিডের মাথার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে সেটা যেন তার নজরেই পড়ল না। নিজের খাওয়া নিয়েই ব্যস্ত। ছোট ছোট তু'টো পুতুলের মতো হাত দিয়ে একটা একটা ক'রে তিন চারটে কড়া চিনেবাদাম ভাজা ছাড়িয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেল। কুড়মুড় কুড়মুড় শব্দ করতে করতে ছোট্ট ঠোঁট তু'টো সলতের মতো জিব দিয়ে আয়েস ক'রে চাটতে লাগল। তারপর হজমি থেকে খানিকটা হজমি নিয়ে সরষের চেয়েও ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে মুখের মধ্যে ফেলতে লাগল একটা একটা করে। দেখে শংকরের বেজায় হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু হাসি চেপে রাখল। যদি লোকটা একবার রেগে যায় তো বেঁকে বসলে কি হবে কে জানে। হজমির বহর দেখে সত্যি তার মনে হল আড়াই মণ তো বটেই!

শংকর লক্ষ্য করল এমনি ক'রে লোকটা ক্রমাগত হজমি, কড়া চিনেবাদাম আর ফুচকা খেয়ে যেতে লাগল। শংকর বুঝতে পারল না এখনো কথা বলা ঠিক হবে কি না!

একপাশে বড় বিস্কুটের টিনের কৌটোর মতো একটা কি যেন, আর বড় সাইজের ব্যাঙের ছাতার মতো একটা জিনিস। শংকর প্রথম বুঝতে পারল না কি দরকারে ও-তু'টো এখানে আছে। পরে বুঝতে পারল, যখন তুপুরের রোদে আকাশ ফাটতে লাগল।

শংকর দেখল লোকটা ছাতার নিচে কৌটটার মধ্যে গিয়ে বসল। বুঝল রোদ্দুরে কষ্ট পাওয়ার জন্যেই ওই ব্যবস্থা। খাসা বুদ্ধি তো।

শংকর তু'তিনখানা রুমাল মাথায় পাগড়ির মতো বাঁধল।

তারপর ব্যাগ থেকে মাথা আর চোখ ঢাকা টুপিটা বার ক'রে পরল। আর হু'টো ঘণ্টা কোনো রকমে যদি কাটাতে পারে তো…

শংকর ভাবছে লোকটার সঙ্গে কি ভাবে আলাপ শুরু করা যায়। ঠিক এই সময় বেতারে প্রধানমন্ত্রীর গলা এল, কি শংকর ঘোষাল, এবার তো নিশ্চয় একটা খবর দেবে। অনেকক্ষণ তো চুপচাপ আছ।

শংকর লোকটাকে যেমন দেখেছে, যা যা করতে দেখেছে সব কথা খুলে জানালো প্রধানমন্ত্রীকে। বলল, সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার পাঁচশো ফুচকা, আড়াই মণ হজমি আর সাড়ে-তিরিশ সের কড়া চিনেবাদাম ভাজা খাওয়ার কথা যা শুনেছে তা এত-টুকু মিথ্যে নয়। খাওয়ার বহর দেখে অবাক বনে যেতে হয়। কি ক'রে যে হজম করে! শংকর আরো জানালো, লোকটা একটানা খেয়ে যেতে পারে। এখন ছাতার নিচে ব'সে বিশ্রাম নিচ্ছে। যে রকম ভাবে মাথা দোলায় আর হাত ঘোরায় তাতে মনে হয় সত্যি খুব হাসিখুশি মেজাজের লোক। মনে হচ্ছে লোকটা এখুনি গান ধরবে একটা। গান ধরবার আগে লোকে যেমন ক'রে সুর ভাঁজে সেই রকম সুর ভাঁজার চেষ্টা করছে। আর গান ধরলেই শংকর মাথা নেড়ে নেড়ে তুড়ি দিয়ে তাল দেওয়ার চেষ্টা করবে। এমনি ক'রে লোকটা খুশি হয়ে যখন আলাপ জমাবে তখন শংকর আস্তে আস্তে সুযোগ খুঁজবে। আর আলাপ একটু জ'মে গেলেই সে সুযোগ বুঝে কাতুকুতু দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাই রোদ না-পড়া পর্যন্ত বিকেলের আগে অবধি তাঁদেরও ধৈর্য ধ'রে থাকতে হবে।

শংকরের সব কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী খুব খুশি হলেন। সে

যে প্ল্যান করেছে তারও খুব তারিফ করলেন। বললেন, সে যা ভাল বোঝে সেই ভাবেই যেন এগিয়ে যায়। তারপর বেতারযন্ত্র ছেড়ে দিলেন।

বড় বড় ওস্তাদরা গান গাইবার সময় শূন্যে হাত নাড়েন, হাত দিয়ে কান ঢাকেন; সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটাও অনেকটা সেই রকম করতে লাগল। তারপর একটু থেমে ওপরের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

শংকর ভাবল এই সুযোগ। এই ফাঁকে লোকটার সঙ্গে একটুখানি আলাপ পরিচয় ক'রে রাখা ভাল।

শংকর তাড়াতাড়ি পকেটে হাত চালিয়ে বুলুর দাদার 'লেখা কাগজের টুকরোটা পকেটে ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। শংকরের আঙুলে কাগজের টুকরোটা ঠেকল। সে বার ক'রে আনল কাগজের টুকরোটা। কুঁচকে গেছে কাগজটা, ভাঁজ পড়েছে অক্ষরগুলোর গায়, তবে পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে বুলুর দাদার হাতের লেখা। সে লেখাটা চোখের সামনে ধ'রে এক ফাঁকে সুযোগ বুঝে গদগদ হয়ে পড়তে আরম্ভ করল:

লোকটি তুমি ছোটখাটো সাড়ে-সাত-ইঞ্চি
চুড়োয় উঠে ব'সে আছ, শহর লাগে ঘিঞ্জি।
তোমার খাওয়া ইতিহাসে দিগ্বিজয়ের তুল্য
জ্ঞানের বেলুন, তোমায় সবাই তাই উঁচুতে তুলল।

বুলুর দাদাকে সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার খাওয়ার কথা আর চোদ্দটা ভাষায় গান গাওয়ার কথা বলেছে, তারপর বলেছে, তুমি তো অনেক লেখ। এই লোকটা সম্পর্কে একটা লেখ তো। লিখতে না পারলে মান সম্মান চ'লে যাবে এই ভয়ে খুব তাড়াতাড়ি লিখে দিয়েছেন বুলুর দাদা।

আশ্চর্য ! বার দুই তিন সুর ক'রে পড়বার পর লোকটার গম্ভীর মুখ হাসিতে চিকচিক করল। শংকর বুঝতে পারল লোকটা তারিফ করেছে তার কথাগুলো। শংকর পড়ার শেষে নমাজ পড়ার মতো সামনের দিকে হাত ছড়িয়ে মাথা হেঁট করল।

সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটা যে হঠাৎ খুশিতে এমন ডগমগ হবে তা কি সে একবারো ভেবেছে।

লোকটা হিন্দিতে কথা বলতে পারে ওস্তাদের মতো। ভারি সোজা আর মিঠে হিন্দি বলে। শংকর তার কথা ভালই বুঝতে পারল। শংকর হিন্দিতে তার কথার উত্তর দিতে গিয়ে বার বার বাংলা ব'লে ফেলেছে। আর লোকটারও বোধ হয় বাংলা বলার ইচ্ছে হল খুব। সে বাংলায় কথা বলা শুরু করল। কিন্তু তারও অবস্থা হল ঠিক শংকরের মতো। সে ক্রমাগত ভুল বাংলা বলতে আরম্ভ করল। আর বাংলার সঙ্গে খুব বেশি হিন্দি কথা মিশিয়ে ফেলতে লাগল। ব্যাপারটা মন্দ হল না। শংকর ভাঙা-ভাঙা হিন্দি আর ভুল হিন্দিতে কথা ব'লে চলল। আর লোকটা আলাপ জমাতে লাগল ভুল আর ভাঙা-ভাঙা বাংলায়।

শেষকালে ঠিক হল তারা তো দু'জনের কথা দু'জনেই বুঝতে পারে। তবে আর অসুবিধের মধ্যে গিয়ে কি লাভ। সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটা হিন্দি ভাষাতেই কথা বলবে আর শংকর নিজের মাতৃভাষায় কথা বলবে।

কিন্তু একটা খবর পেয়ে সে খুশি হল। লোকটা বাংলায় কথা বলতে না পারলেও বাংলা গান গাইতে পারে। তা ছাড়া বাংলা গান সে পছন্দও করে অনেক বেশি। শংকর লক্ষ্য করল যতক্ষণ সে আলাপ জমাচ্ছে ততক্ষণ সেই সাড়ে-সাত-ইঞ্চি

লোকটা এক নাগাড়ে ফুচকা হজমি আর কড়া চিনেবাদাম খেয়ে যেতে লাগল, যেমন ক'রে লোকে গল্প করতে করতে পান বিড়ি সিগারেট খায় আর কি।

শংকর লোকটার হাবভাবে বুঝল সে এবার সত্যি গান ধরবে। কিন্তু এইবার তো তাকে একটা খবর পাঠাতে হয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। সে এক মিনিট সময় চেয়ে নিল সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার কাছ থেকে।

তারপর প্রধানমন্ত্রীকে বেতারে ডেকে সব খবর পাঠালো। বলল, এইবার লোকটা গান আরম্ভ করবে। ওর মেজাজ যদি কোনো রকমে বিগড়ে যায় তো ওকে নামানো মুশকিল হবে। খুব ধীরে সুস্থে ওর মেজাজ বুঝে, তবে আসল কাজ শুরু করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শংকরের কথায় বুঝলেন, ভারি হুঁশিয়ার ছেলে শংকর। ওকে আর বেশি পরামর্শ দেওয়ার দরকার নেই। ও ঠিক ঝোপ বুঝে কোপ মারবে।

তারপর সে কী প্রাণ মাতানো গান! শংকরের অনুরোধে সে একখানা বাঙলা গানই ধরল।

পিরামিডের মাথার ওপরে, মাটি থেকে চারশো-একাশি ফুট উঁচুতে ব'সে কার না শুনতে ভাল লাগে, ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা···গম গম করতে লাগল চারিপাশ সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার গলার আওয়াজে। শংকরের বুক গর্বে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ধন্য বাঙলা ভাষা, ধন্য বাঙালী, আর ধন্য সে নিজেও—চার-ফুট আট-ইঞ্চি চোদ্দ বছরের শংকর ঘোষাল।

রোদ অনেকক্ষণ প'ড়ে গেছে! ভালই লাগছে লোকটার

গান। বাঙলা ছাড়া লোকটা ইংরেজি, ফরাসী আরো দু'-পাঁচটা ভাষায় গান গাইল। যেমনি কথা তেমনি সুর। মাঝে মাঝে অবিশ্যি মনে হল লোকটা তেড়ে আসছে তার দিকে। কিছু গানের সে ভাসা ভাসা মাত্র ভাষাটা বুঝল, আর বাকি মাথা-মুণ্ডু কোনো কিছু বুঝল না। শংকরও প্রফুল্লবিকাশবাবুর কথার লিস্ট থেকে বাছা বাছা ক'টা কথা যা মনে এল প্রাণ চাইল ব'লে গেল। লোকটার মুখ চোখ বেয়ে হাসিখুশি উপচে পড়ছে। শংকরের ওপর বেজায় খুশি হয়ে লোকটা একটু এলিয়ে শুয়ে পড়ার মতো হয়েছে যেই অমনি শংকরের মনে হল, একটু কাতুকুতু দিয়ে দেখা যাক কি হয়।

যেই শংকর লোকটার বগলে একটু কাতুকুতু দিয়েছে সে তো অমনি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে মাটিতে চিৎ। শংকর আবার যেই একটু কাতুকুতু দিয়েছে সে কী খিলখিল ক'রে হাসি। শংকরও যেন মজা পেয়ে গেল, আবার একটু কাতুকুতু দিল।

প্রধানমন্ত্রী বেতারযন্ত্রের কাছে এসে শংকরের খবর নেওয়ার জন্যে যেই খোঁজ করেছেন, শংকর আর কোনো কথাটি না ব'লে সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার মুখে বেতারযন্ত্র লাগিয়ে দিয়ে আরো জোর কাতুকুতু দিতে লাগল।

শংকরের গলার আওয়াজ এল না। তার বদলে এল এক-টানা হাসির খিলখিল শব্দ। সে কী হাসি-রে বাবা! হাসির চোটে প্রধানমন্ত্রীর কান ফেটে যাবার জোগাড়। তিনি বুঝতে পারলেন শংকর নিশ্চয় লোকটাকে কাতুকুতু দিচ্ছে। না হলে এমন হাসি কোথা থেকে আসবে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, মেয়র, ডেপুটি মেয়র, অলডারম্যানদের সকলকে বেতার

যন্ত্রটা একবার ক'রে ধরতে বললেন। যিনি ধরেন তাঁরই কানে সেই পিলে চমকানো হাসি গেল। হাসিটা একবার কাছের, একবার দূরের। লোকটা গড়াগড়ি দিচ্ছে? আবার যখন প্রধান-মন্ত্রী বেতারযন্ত্র ধরলেন তখন আর কোনো সাড়া-শব্দটি নেই।

এ কী হল! হাসি একেবারে বন্ধ কেন? ঘাবড়ে গিয়ে তিনি তক্ষুণি শংকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিহে শংকর, হঠাৎ চুপচাপ কেন?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল শংকরের কাছ থেকে, আর হাসি শুনতে পাবেন কোথা থেকে। লোকটাকে আঠা-লাগানো টেবিল ক্লথ দিয়ে মুড়ে ফেলেছি। গোটাতে আরম্ভ করেছি, এইবার ব্যাগের মধ্যে কিম্বা পকেটের মধ্যে পুরে ফেলব।

—সাবাস্ সাবাস্ শংকর, প্রধানমন্ত্রীর কথাগুলো শংকরের কানে কতক্ষণ ধ'রে যে বাজতে লাগল তা শংকর নিজেই জানে না। প্রধানমন্ত্রী বেতারযন্ত্র ছাড়বার আগেই শংকর তাঁকে একটা দরকারি খবর দিয়ে দিল। সে বলল, আমি কিন্তু স্যার আজ রাত্তিরেই নামতে আরম্ভ করব না। আমি কাল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ভোরের দিকে লোকটার জন্য হেলি-কোপ্টারে আবার ফুচকা হজমি আর কড়া চিনেবাদাম আসবে। আমি তো নামবার সময় খুব আস্তে আস্তে নামব। সময় লাগবে। তাই ব্যাগে ওর খাবার ভরে নিতে হবে। আপনি মিশরের প্রেসিডেণ্টকে কাল ভোর বাদ দিয়ে, হেলিকোপ্টারে আর ওর জন্যে খাবার পাঠাতে বারণ করুন। আপনারা একটু সজাগ হয়ে জাল ধ'রে থাকবেন। লোকটা কখন কী মেজাজে থাকে কেউ তো বলতে পারে না। আবার হয়তো ব্যাগ কেটে কিম্বা পকেট ফুটো ক'রে কখন নিচে জালের ওপর লাফিয়ে

পড়বে কোন সময়। ও লোকের তো অসাধ্য কিছু নেই।

প্রধানমন্ত্রী এখন নিশ্চিন্ত হলেন। সবাইকে খবরটা দিয়ে দিলেন। দলের সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। হরেনবাবু বার বার ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। শংকর যে তাঁর মুখ রেখেছে এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছু নেই। আসল কাজটাই যখন চুকে গেল তখন এ কষ্টটুকু আর কারো গায়ে লাগবে না। না হয় শংকর নামতেই একটু দেরি করবে, তাতে আর কি হয়েছে। সবাই বাকি কাজটুকুর অপেক্ষায় দ্বিগুণ উৎ-সাহে জাল ধরার জন্যে ঘাড় পিঠ সোজা ক'রে দাঁড়ালো। কুড়ি-জন জোয়ান লোক বলল, দরকার হলে দলের সবাই তাঁবুতে ফিরে যেতে পারে, এক'টা দিন সব সময়ের জন্যে তারাই জাল ধ'রে থাকতে পারে।

শংকর নামবার সময় তরতর ক'রে নেমে আসতে পারত। কিন্তু উঠতে তার শরীরে এত বেশি জোর লেগেছে যে বেচারা নামবার সময় ব'সে ঘুমিয়ে জিরিয়ে সব ক্ষতিটুকু পুষিয়ে নিল। লোকটা আশ্চর্য শান্ত হয়ে ঘুমিয়েছে। অমন খাই-খাই লোক একবারো খাওয়ার জন্যে জ্বালাতন করে নি। শংকর তার একদিনের খাবার আটদিনে ভাগ ক'রে নিয়েছে। কারণ নামতে শংকরের প্রায় সাত-আট দিন সময় লেগেছে কম ক'রে। শংকর তাকে বলেছে কয়েকটা দিন একটু শান্ত হয়ে থাকতে তারপর নিচে নেমে সে কত ফুচকা হজমি আর কড়া চিনেবাদাম খেতে চায় খাক না। সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটা যখন বুঝতে পারল শংকর তাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কেমন অদ্ভুত শান্ত আর ভাল মানুষটির মতো চুপটি করে রইল। তার

ভয়, যদি খাওয়া নিয়ে কিছু হামলা করে তবে শংকর হয়তো আবার তাকে সেই পিরামিডের মাথার ওপর তুলে রেখে আসবে। কলকাতায় আর তার যাওয়া হয়েছে বটে! হ্যাঁ, তবে শংকর যখন নিজেকে মইয়ের সঙ্গে বেঁধে ঘুমিয়েছে, তখন নানা ভাষায় লোকটার গান শুনেছে। শংকরের ব্যাগের মধ্যে থেকে লোকটা গান গেয়েছে। এই ভাবে শংকর একদিন চারশো একাশি ফিট উঁচু পিরামিডের মাথার ওপর থেকে একেবারে মাটিতে নেমে এল।

উপসংহার

শংকর চারশো-একাশি ফিট উঁচু থেকে নিচে নেমে এসে দাঁড়ালে সে কি হাততালির শব্দ রে বাবা! এতক্ষণ যাঁরা ঠায় জাল ধ'রে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা শংকর নিচে নামা মাত্র জাল ছেড়ে ধপ ধপ ক'রে মাটির ওপর বসে পড়লেন। যেন এতক্ষণে বিশ্রামের সময় পেলেন সত্যি সত্যি। চারটে চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচে চারটে গোল হলে দর্শকরা হৈ-হৈ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলে যেমন শব্দ হয়, এও বুঝি তেমনি। আর প্রধানমন্ত্রী তো ছুটতে ছুটতে এসে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। ঠিক খেলার মাঠে গোল দিলে তিমিরবরণ আর অমলশংকর তাকে যেমন ক'রে খুশিতে লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরে।

সবাই ছুটে এসে যখন ঘিরে ধরলেন শংকরকে তখন শংকর বুঝতে পারল, এতক্ষণে টের পাওয়া যাচ্ছে কোথায় উঠেছিলুম। এ-ক'টা দিন লোকটার কথায় এমন বিভোর হয়েছিল সে যে নিজের শরীরের কথা মনেই ছিল না। যেন অন্য একটা লোকের দু'টো হাত আর দুটো পা ভাড়া নিয়ে সে কাজে নেমেছে।

এইবার মজা হল অন্য রকম। যতক্ষণ শংকর মইয়ের ওপর ছিল সবাই চোখ আকাশে তুলে শংকরের কথাই ভেবেছে সমানে। আর এখন সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটাকে নিচে নামিয়ে আনার পর দলের লোকেরা সব হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল শংকরের ঘাড়ের ওপর, লোকটাকে দেখে চক্ষু সার্থক করার জন্যে। তার চারিপাশ ঘিরে চক্ষের নিমেষে সে কী ভিড় জমে গেল!

প্রধানমন্ত্রী তখন একবার শংকরের ব্যাগ টিপে দেখছেন, একবার পকেট হাতড়াচ্ছেন। কুড়ি জন জোয়ান লোক দলের লোকেদের অনুরোধ জানিয়ে দু'হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। খেলার মাঠে ভিড় হলে পুলিশ যেমন ক'রে লোক সরায়।

শংকর লোকটাকে টেবিলক্লথে-মোড়া অবস্থায় পিঠে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বার ক'রে দিল। প্রধানমন্ত্রী তাড়াতাড়ি গয়নার সুন্দর ভেলভেটের একটা বাক্সের মধ্যে সাড়ে-সাত ইঞ্চি লোক-টাকে পুরে ফেললেন। এই বাক্সটাই শংকর প্রধানমন্ত্রীর তাঁবুর মধ্যে দেখেছে। মেয়ের জন্যে গয়না কিনেছিলেন। পরে বাক্সটা এমন একটা দরকারি কাজে লেগে গেল দেখে খুশি হলেন। তাঁবুর মধ্যে ব'সে ব'সে ছুরি দিয়ে বাক্সটার একদিকে সিকি-আঙুল কেটে একটা জানলার মতো করেছেন।

নিজের তাঁবুর দিকে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী সটান। দলের দু'

জন ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে ছুটলেন প্রধান-মন্ত্রীর তাঁবুতে। লোকটার শরীর পরীক্ষা করলেন তাঁরা। এখুনি একবার পালস্ দেখা দরকার। কম ধকল যায় নি তো এই ক'টা দিন।

শংকরকে হরেনবাবু নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। সাড়ে সাত-ইঞ্চি লোকটাকে পরীক্ষা করবার পর ডাক্তার দু'জন শংকরকে একবার পরীক্ষা করবেন। হরেনবাবু শংকরকে এক রকম পাঁজাকোলা ক'রে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে এলেন।

কুড়ি জন জোয়ান লোকেদের পাঁচজন সব তাঁবুতে ঘুরে ঘুরে একটা খবর সবাইকে জানিয়ে দিল। অনেকটা ঢেঁড়া পেটানোর মতো তারা খবরটা ঘোষণা করল, প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ডাক্তাররা লোকটাকে পরীক্ষা করেছেন। সে বেশ ভালই আছে। তবে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাঁচশো ফুচকা, আড়াই মণ হজমি আর সাড়ে-তিরিশ সের কড়া চিনেবাদাম ভাজার ব্যবস্থা এখুনি আগে করতে হবে। তারপর সে নিয়মিত খাওয়া শুরু ক'রে দিলে দলের সবাই দু'চার জন ক'রে প্রধানমন্ত্রীর তাঁবুতে তাকে দেখে আসবে।

ডাক্তার দু'জন শংকরকে একবার ভাল ক'রে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন তার এখন খুব ভাল বিশ্রাম দরকার। তাই তাঁবুতে সে পঁচিশ তিরিশ দিন বিশ্রাম নেবে এই ঠিক হল।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, শংকর তুমি শুধু শুধু সময়টা নষ্ট করবে কেন, শুয়ে ব'সে আরাম ক'রে তোমার পিরামিডের মাথায় ওঠার অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় বেশ গুছিয়ে লিখে ফেল। অভিযানের কাহিনী ঠিক মতো লিখতে পারলে পড়তে চমৎকার লাগবে।

এতদিন তো তুমি নানা অভিযানের কাহিনী পড়েছ। এইবার তুমি নিজে একটা মস্ত অভিযানের পাণ্ডা হলে। লেখা হয়ে গেলে বাংলার মাস্টারমশাই প'ড়ে যেখানে দরকার সেখানে ঠিক ক'রে দেবেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে বইয়ের ভূমিকা লিখে দেবেন। তারপর তোমার বই পাঠ্যপুস্তকও ক'রে দেওয়া যেতে পারে। আর এ বই বিক্রিও হবে যথেষ্ট।

স্টাফ-ফোটোগ্রাফাররা অবিশ্যি শংকর চারশো-একাশি ফিট উঁচু থেকে নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে শংকরের আর সাড়ে সাত-ইঞ্চি লোকটার খানকয়েক ছবি তুলে নিল টপাটপ দেখতে-না-দেখতে। তাঁরা অবিশ্যি প্রধানমন্ত্রীর তাঁবুতে গিয়েও লোকটার বিভিন্ন অবস্থায় ডজনখানেক ছবি তুললেন। এই সব ছবি অভিযাত্রী দল ভারতে পৌঁছবার আগেই সেখানের সব বড় বড় কাগজে ফলাও খবরের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে।

দলের মধ্যে উৎসাহী কেউ কেউ মিশর দেখতে বেরিয়ে পড়লেন। হরেনবাবু স্টাফ্-ফোটোগ্রাফারদের কাছ থেকে দু'চার-খানা মনের মতো ছবি চেয়ে নিলেন জিওগ্র্যাফি বইয়ের জন্য। এ ছবিগুলোর জন্যে বইখানার দাম কত বাড়ানো যায়, তাই ভাবতে লাগলেন। আর এই ফাঁকে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে তাঁর বইয়ের একটা ভূমিকা লিখিয়ে নেওয়া যায় কিনা। শংকরও শুরু ক'রে দিল অভিযানের কাহিনী।

যে বিমানখানা ক'রে শংকররা মিশরে এসেছিল, আবার সেই বিমানখানা পিরামিডের নিচে এসে দাঁড়ালো! সাড়ে-সাত ইঞ্চি লোকটাকে নিয়ে আগে প্রধানমন্ত্রী উঠলেন। তারপর পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, কলকাতার মেয়র, ডেপুটি মেয়র দলের

আর সব উঠলেন। হরেনবাবুর সঙ্গে সবশেষে শংকর যখন উঠতে যাচ্ছে তখন মিশরের প্রেসিডেণ্ট আরেকবার করমর্দন করলেন তার সঙ্গে।

অভিযাত্রী দল আর সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটাকে নিয়ে বিমান খানা দেখতে দেখতে ভারতের দিকে যাত্রা করল।

পালাম বন্দরে আবার ঠিক সময়ে এসে শংকরদের বিমান নামল। বিমান বন্দর তো লোকে লোকারণ্য। ঠিক বিদেশ থেকে বড় বড় লোকেরা ভারতবর্ষে এলে যে রকম ভিড় হয় পালাম বিমান বন্দরে। এও যেন সেই রকম। হয়তো বা তারও চেয়ে বেশি।

আবার আরেক দফা কানে তালা-লাগানো হাততালি। আবার প্রধানমন্ত্রীর পাশে শংকরকে নিয়ে অভিযাত্রী দলটির কয়েকখানা ফোটো নেওয়া হল।

তারপর তো একখানা খোলা গাড়িতে ক'রে স্বয়ং প্রধান-মন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে শংকর রাস্তার দু'পাশে জনতার অভিবাদন কুড়োতে কুড়োতে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে এসে উঠল। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে লোকে এর ওর কাঁধের ওপর দিয়ে মাথা গলিয়ে খালি উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটাকে দেখার জন্যে। শংকর বা প্রধানমন্ত্রী কেউই এখন লোকের চোখে পড়ছে না। সবাইক্যর লক্ষ্য সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটা। নেহাতই যখন প্রধানমন্ত্রীর হাতে-ধরা বাক্স কারো নজরে পড়ছে না, সবাই শংকরকে দেখার চেষ্টা করছে। যতক্ষণ খোলা গাড়ির ওপর প্রধানমন্ত্রী শংকরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন ততক্ষণ সমানে বুকের কাছে ভেলভেটের বাক্সের মধ্যে সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটাকে ধরে থেকেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে ওই অবস্থায় দেখে

শংকরের একবার একটু হাসি পেয়েছে। ঠিক যেন মিঠু তার ছোট্ট খেলার পুতুলটাকে বুকে ক'রে আছে।

তারপর সোজা এসে উঠল সবাই প্রধানমন্ত্রীর মস্ত বাগান-বাড়িতে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, মেয়র আর ডেপুটি মেয়রের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীব নানা আলাপ-আলোচনা হল বাহাত্তর ঘণ্টা ধ'রে। স্টাফ্-রিপোর্টাররা সে সব খববও জোগাড় করলেন।

ঠিক হল সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটাকে নিয়ে মেয়র কলকাতায় রওনা হবেন। আর লোকটাকে রাখা হবে চিঁড়িয়াখানায় তার পছন্দ মতো জায়গায়। প্রধানমন্ত্রী বাব বার ক'রে সতর্ক করলেন মেয়রকে লোকটার খাওয়া-দাওয়াব বিষয়ে। পাঁচশো ফুচকা, আড়াই মণ হজমি আর সাড়ে-তিরিশ সের কড়া চিনেবাদাম ভাজা যেন ঠিক কলকাতা কর্পোরেশনের হেল্‌থ অফিসারকে দিয়ে পবীক্ষা করিয়ে চিঁড়িযাখানায পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, এবাব তো বিশেষ অধিবেশনেব জরুরী বিষয়গুলোব আলোচনা শুরু করতে হবে। আর তো মুলতবি রাখা চলে না। রাখলে তাব মান সম্মান চ'লে যাবে। তিনি তাই আজ থেকেই কাজ শুরু ক'রে দিতে চান। মেয়রকে বার বার বললেন, তিনি যেন সব খবর ঠিক মতো তাঁর কাছে পাঠান।

শংকর আর হরেনবাবুও পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী, কল-কাতার মেয়র, ডেপুটি মেয়র, অলডারম্যান, কাউন্সিলারদের সঙ্গে একই বিমানে দমদম বিমান বন্দরে এসে নামলেন।

কোথায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী আর কোথায় কলকাতার মেয়র, হৈ-হৈ প'ড়ে গেল শংকর ঘোষালকে নিয়ে। চার-ফুট আট-ইঞ্চি চোদ্দ বছরের শংকরকে দেখার জন্যে বুঝি সারা কলকাতা শহর একেবারে ভেঙে পড়েছে। এতদিন খবরের কাগজে

যার কথা রোজ প'ড়ে এসেছে, যার অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি দেখে এসেছে, আজ স্বয়ং সে নিজে এসে দাঁড়িয়েছে সেই হাজার হাজার লোকের চোখের সামনে। মুগ্ধ চোখে সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। শংকরের খুব লজ্জা করছিল।

শংকরের কলকাতায় ফেরার খবর পেয়ে তার বাবা, মা, ছোটবোন মিঠুও এসেছে।

এবার শংকরের যে ছবি নেওয়া হল সেই ছবিতে তার বাবা, মা, আর ছোটবোনও থাকল। বাবা আর মা-র মাঝখানে মিঠু দাদার হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। ছবি যখন তোলা হল শংকর একবার শুধু ভাবল, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অমল তিমির আর বোকাদা সব কিছু দেখছে নাকি।

শংকর শেষে বাবা মা-র সঙ্গে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরল।

খবরের কাগজে পরদিন খবর পাওয়া গেল লোকটাকে নিয়ে আগের ব্যবস্থা মতো মেয়র চিঁড়িয়াখানায় হাজির হয়েছেন। লোকটার ইচ্ছা মত তাকে জলের ধারে সাদা হাঁসের মুখোমুখি গাছপালা লতাপাতা ঘেরা জায়গায় একটা সুন্দর কাচের খাঁচার মধ্যে রাখা হয়েছে। তার নিয়মিত খাওয়া ফুচকা হজমি আর চিনেবাদাম ভাজার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। লোকটার নাকি খুব পছন্দ হয়েছে। বলেছে, জলের ধারে ব'সে হাঁসের সাঁতারকাটা দেখতে দেখতে যখন যে-ভাষায় খুশি গান গাইবে।

এদিকে স্কুলে শংকরকে নিয়ে তো লোফালুফি হবার জোগাড়। হেডমাস্টারমশাই প্রপন্নপালকবাবুকে সেক্রেটারী মশাই বিষণ্ণভূষণবাবু ডেকে বললেন, একটা ভাল মতো সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করুন।

স্কুলের দরজা সরস্বতী পুজো বা বিশেষ কোনো উৎসবে যেমন ক'রে সাজানো হয় সেই রকম জমকালো ক'রে সাজানো হল। স্কুলের বড় হলঘরে সব কিছুর ব্যবস্থা হল। ঠিক হল সভাপতি হবেন মেয়র, আর প্রধান অতিথি হয়ে আসবেন পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী।

শংকর দেখল অমলশংকর যেন আব সেই অমলশংকর নেই। তার অনেক দিনের আগের বন্ধু অমল হয়ে গেছে। না হলে শংকরের সম্বর্ধনা সভায় অমল অমন প্রাণদিয়ে খাটতে পারত না।

অমলের কাছ থেকেই শংকর শুনল তিমিরবরণ ট্র্যান্স্‌ফার সার্টিফিকেট নিয়ে অন্য স্কুলে চ'লে গেছে। অমল আবো বলেছে, শংকরের এই ব্যাপারে আরো বেশি লজ্জা পেয়েই তিমির এক রকম মুখ দেখাবার ভয়ে স্কুল ছেড়ে পালিয়েছে।

সভায় প্রধানমন্ত্রী আর মেয়র, এঁরা দু'জন নিজেদের চোখে দেখা শংকরের অভিযানের কথা বর্ণনা করলেন। শুনতে শুনতে স্কুলের মাস্টারমশাইরা চোখ বড় বড় করলেন। হরেনবাবুকেও কিছু বলতে অনুরোধ করা হল। তবে তিনি বললেন তিনি তো সব সময় এখানে সকলের কাছাকাছিই আছেন, তাঁর মুখ থেকে তো যখন-তখন শোনা যাবে এ গল্প। আর এ গল্প কি একদিনে একঘণ্টা বললে ফুরিয়ে যাবে নাকি। যতদিন মথুরানাথ বিদ্যা-পীঠ থাকবে, ততদিন এ গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরবে।

স্কুলে শংকরের খ্যাতি যেমন রাতারাতি ভীষণ বেড়ে গেল, তেমনি অসুবিধেও একটা দেখা দিল।

শংকরের এমন একটা বড় রকমের সাফল্যের পর স্কুলের

সব মাস্টারমশাইরা খুউব খুশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন ঘাবড়েও গেলেন।

নিখিলেশ্বরবাবুর মতো ভয়ঙ্কর রাগী আর মারমুখো লোকও যেন সব দেখে-শুনে ভোজবাজির মতো চুপসে গেছেন।

শংকরের কানে আর কেউ হাত তোলেন না। কেউ আর শংকরকে ধমক দিয়ে কথা বলেন না। মহা ফাঁপরে পড়ল সে।
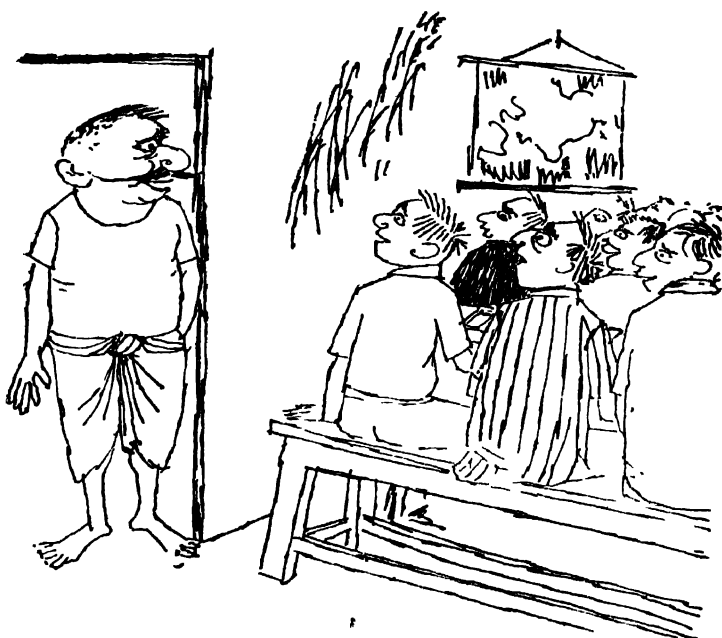
ফোন আসেছে, শংকর ঘোষাল

যেন পিরামিডের মাথার ওপর থেকে সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোক-টাকে নামিয়ে এনে খুব একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছে। না হলে এমন ক'রে সব ওলোট-পালোট হয়ে যাবে কেন।

হরেনবাবু যে হরেনবাবু, তিনিও এই অভিযানের পর কি

রকম হয়ে গেছেন যেন। শংকরকে অন্য চোখে দেখতে লাগলেন। মিসিসিপি কোথায় আর মাডাগাস্কার কোথায়—মানচিত্রে হরেনবাবু যদি শংকরকে দেখিয়ে দিতে বলেন, আর সে যদি প্রশ্ন শুনে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কিংবা বলে, মিসিসিপি মাডাগাস্কারের উপকূলে, তা হলেও হরেনবাবু তার কান ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়ে ধরি-ধরি ক'রেও ধরতে পারেন না। পিছিয়ে যান, হাত সরিয়ে নেন।

ব্যোমকেশবাবুর অঙ্কের ক্লাশেও তাই। বোর্ডের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে শংকর। আর তিনি দু' চোখ পাকিয়ে কপালে তোলেন। এই গাঁট্টা দিলেন আর কি। কিন্তু হাত তুলেও নামিয়ে নেন। হঠাৎ-ই কি মনে পড়ে বুঝি, আর ঘাবড়িয়ে যান। আর ঠিক এই সময় দারোয়ান শিউনন্দন ক্লাশের দরজার সামনে এসে হাঁক দেয়, ফোন আসেছে, শংকর ঘোষাল।

ক্লাশশুদ্ধ সব ছেলে চমকে ওঠে। শংকর ঘোষালের ফোন এসেছে। তার মানে ফোনে শংকরকে কেউ ডাকছেন। নিশ্চয় পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী কিংবা ক্যালকাটা কর্পোরেশনের মেয়র হবেন।

শংকর ব্যোমকেশবাবুর কাছ থেকে অনুমতি চাইতে তিনি হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন। এ-রকম ফোন চোদ্দ বছর বয়সের চার-ফুট আট ইঞ্চি শংকর ঘোষালের কাছে আসে আর তাঁরা সব একবার ব'সে আর একবার দাঁড়িয়ে, এই ক'রে ক'রে বুড়ো হয়ে গেলেন, চুল পেকে গেল।

হেডমাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন, শংকর, তেনজিং নোরকে তোমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আলাপ করতে চান। রাইটার্স বিল্ডিং থেকে খবর গেছে মেয়রের

কাছে। মেয়র ফোন করেছেন এখানে। তুমি মেয়রের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে দিন-ক্ষণ জানিয়ে দিয়ো। তোমার সুবিধে হবে কবে তা তো ওঁদের কারো জানা নেই। তুমি কাল দেখা করছ তো মেয়রের সঙ্গে? আমি ফোনে তা হলে ওঁকে জানিয়ে দিই। তেনজিং এ উইকেই কলকাতায় আসছেন, জান তো?

শংকর মাথা নিচু ক'রে লজ্জা পেয়ে বলল, আপনি যা বলবেন তাই হবে স্যার।

এই রকম ফোন শুধু একদিন নয়, প্রথম প্রথম রোজ, তার-পর সপ্তাহে দু'-চার দিন ক'রে আসতে লাগল। স্কুলের সব ছেলেদের কাছেও ব্যাপারটা পরিষ্কার হল যে শংকর রীতিমতো গন্যমান্য লোক হয়ে উঠেছে।

ওদিকে সাড়ে সাত-ইঞ্চি লোকটাকে নিয়ে তো আরেক হাঙ্গামা বাঁধল। চিঁড়িয়াখানায় লোকটাকে নিয়ে যাবার পর লোকটার মন-মেজাজ ভালই ছিল। পাঁচশো ফুচকা, আড়াই মণ হজমি আর সাড়ে-তিরিশ সের কড়া চিনেবাদাম ভাজা খেয়েছে নিয়মিত, আর মনের আনন্দে মাথা নেড়ে নেড়ে, পা দুলিয়ে, হাত ঘুরিয়ে গান গেয়েছে নানা ভাষায়।

খবরের কাগজে সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটার খবর পেয়ে শহর শুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছে চিঁড়িয়াখানায়।

কেউ আর বাঘের খাঁচার কাছে যায় না, সিংহর খাঁচার কাছে যায় না। কেউ জিরাফ দেখে না, হাতি দেখে না, হিপো-পটামাস দেখে না। যত ভিড় ওই সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোক-টার খাঁচার সামনে।

সবাই হাতে হাতে বড় বড় ঠোঙায় ফুচকা আর কড়া চিনে-বাদাম নিয়ে আসে। লোকটা কলকাতার ময়দানের ফুচকা খেয়ে নিজ মুখে স্বীকার করেছে এমন ফুচকা যে শহরে পাওয়া যায়, সে শহর ছেড়ে আর কোথাও যেতে চায় না।

ফুচকা আর চিনেবাদামের ঠোঙা জমতে জমতে স্তূপাকার হয়ে উঠেছে। শেষকালে রাখবার জন্যে জায়গা ঘিরে দিতে হল।

ভিড়ের ভয়ে চিঁড়িয়াখানার টিকিটের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হল। তবু কোনো ফল হল না। ভিড় বাড়ল বই কমল না। আর ভিড় মানে কি ? যে যেখান থেকে পারল ঝেঁটিয়ে এল। কলকাতার-কাছে পিঠের জায়গা থেকে লোকে রেল-গাড়িতে বাদুড়-ঝোলা হয়ে ঝুলতে ঝুলতে এল।

মাস্টারমশাইরা স্কুলে যান না, অধ্যাপকরা কলেজে যান না, উকিল ব্যারিস্টাররা আদালত কাছারিতে যাওয়া ভুলে গেলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল কলেজ পালাতে শুরু ক'রে দিল। সব মিলিয়ে একটা হুলস্থূল কাণ্ড বেঁধে যাবার জোগাড়।

সারা দিনের মধ্যে চিঁড়িয়াখানা খোলা থেকে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত এমন একটি মুহূর্ত নেই, যখন সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোক-টার সামনে ভিড় একটু ফাঁকা হয়েছে।

লোকটা যে ভেতরে এত চটেছে তা বাইরে থেকে দেখে কেউ কিছুমাত্র অনুমান করতে পারেনি।

পরে খবরটা পাওয়া গেল খবরের কাগজে। আর খবরটা পাওয়া মাত্র কলকাতা শহরের সব লোকের মাথায় যেন বাজ পড়ল।

শংকরের বাবা খবরটা প'ড়ে শোনালেন শংকরকে।

কলিকাতা শহরে পিরামিডের মাথা হইতে যে সাড়ে-সাত-ইঞ্চি লোকটিকে চিঁড়িয়াখানায় রাখিবার জন্য আনা হইয়াছে, সম্প্রতি সেই লোকটি সম্পর্কে একটি খবর কানা-ঘুঁষায় শুনা যাইতেছে। খবরটিকে অনেকেই ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, চিঁড়িয়াখানায় লোকটির অবস্থান হেতু ওই স্থানে দর্শকের ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে বাড়িতে এমন অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে যে লোকটির ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে।

গভীর দুঃখের সহিত পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ও কলিকাতার মেয়র মারফৎ সে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক তার পাঠাইয়াছে।

উক্ত তারে নিতান্ত দুঃখের সহিত সে আবেদন জানাইয়াছে যে, সে মানুষ। চিঁড়িয়াখানায় জীবজন্তু দেখিতে আসিয়া তাহার খাঁচার সম্মুখে সর্বক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা তাহার নিকট উপহাসের মতো মনে হইয়াছে। তাহা ছাড়া লোকের অত্যধিক ভিড় হেতু সে সঙ্গীতচর্চা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে।

তাই প্রধানমন্ত্রীর নিকট সে করজোড়ে আবেদন জানাইতেছে যে অনতিবিলম্বে তাহাকে অন্যত্র অপসরণ করিবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক।'

শংকরের বাবা যখন খবর পড়া শেষ করলেন তখন সত্যি বলতে কি শংকর একটি কথাও বিশ্বাস করতে পারছিল না। খুব দুঃখ পেল সে। আর সেই সঙ্গে কলকাতার সমস্ত লোকদের ওপর তার যা রাগ হল না—

আর খবর প্রধানমন্ত্রীর কানে যাওয়া মাত্র সাড়ে-সাত-ইঞ্চি

লোকটার ইচ্ছা পূর্ণ হতে এতটুকু দেরি হল না। কোথা থেকে ভোজবাজির মতো কি একটা হয়ে গেল যেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী আর কলকাতার মেয়রের সঙ্গে চুপি চুপি কি সব দরকারি কথাবার্তা সেরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আবার সেই সাড়ে-সাত-ইঞ্চিকে ভেলভেটের বাক্সে পুরে বিমানে ক'রে দেখতে না-দেখতে দিল্লি উড়ে গেলেন।

পরে আরো জানা গেল প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাড়ির ছাদের ওপর পোষা পাখি-পশুদের সঙ্গে লোকটার থাকবার জন্যে একটা সুন্দর খাঁচা বানিয়ে দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে তাঁকে ডেকে বলেছে, বাবা আমাদের বাড়ির মস্ত ছাদে লোকটার জন্যে একটা খাঁচা তৈরী করিয়ে দাও। সাদা গিনিপিগ, কালো ইঁদুর, সাদা-কালো কুকুর, ডোরা-কাটা বেড়াল, ছাই-রঙা বেজি, সবুজ-রঙা টিয়ে, লাল টুকটুক হীরামন, তা ছাড়া শালিখ, ঘুঘু, পায়রা—এদের সঙ্গে লোকটাকে রেখে দিলে ওর মন নিশ্চয় হাসি-খুশি থাকবে। তুমি কি বলো ?

প্রধানমন্ত্রী বললেন, মা তোমার ইচ্ছে যখন তাই তবে লোকটাকে ছাদের ওপরেই রাখ।

লোকটা প্রধানমন্ত্রীর ছাদের ওপর একটা সুন্দর খাঁচায় রইল।

যাক প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিন্ত হলেন। হাঙ্গামা চুকল। আবার লোকসভায় আর বিধানসভায় জরুরী বিষয়গুলো নিয়ে জোর আলোচনা শুরু ক'রে দিয়েছেন তিনি। এখন আর অন্য কোনোদিকে চোখ কান দেবার সময় নেই তার। সোজা কথা তো নয়। এদিকে ভাষা, ওদিকে খাদ্য।

কিন্তু যা ভাবা যায় তাই কি আর হয়।

আবার গণ্ডগোল বাঁধল। লোকে বলতে আরম্ভ করল, স্বাধীন দেশে সবাই যখন স্বাধীন, তখন সবাই স্বাধীন মতামতও জানাতে পারবে। লোকটা যখন দেশের সম্পত্তি, বিশেষ ক'রে কলকাতায় যখন রাখার কথা হয়েছে, তখন প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির ছাদের ওপর রাখার কোনো মানে হয় না।

শুনে প্রধানমন্ত্রী মোটেই চটলেন না, হাসলেন। বললেন, ও তো কলকাতায় থাকবে ব'লেই এসেছে। আর ময়দানের ফুচকা যে ওর ভাল লেগেছে সে কথাও বলেছে। তবে কলকাতার লোকে যদি ওর সুখ-সুবিধের দিকে নজর না দেয় তো আমি কী করতে পারি। বাধ্য হয়েই আমাকে এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বেশ, লোকটাকে কোথায় কি ভাবে রাখা যেতে পারে তা নিয়ে সাধারণের মতামতই নেওয়া হোক। ওকে যদি এখুনি জোর ক'রে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তো হিতে বিপরীত হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে একটু দুঃখ পেল। লোকটা বেশ ছিল বাড়ির ছাদের ওপর। কিন্তু ভেবে দেখল বাবাই বা কি করে। স্বাধীন দেশে স্বাধীন লোকের স্বাধীন মতামত। সবাইকার সমান অধিকার।

খবরটা ছেপে বেরুবার পর চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল।

আবার জরুরী আলোচনা সব মুলতবি রাখা হল। লোক-সভা আর বিধানসভায় জোর তর্ক-বিতর্ক চলল। সবাই কী হয় জানবার জন্যে হাঁ ক'রে আছে।

তারপর সত্যি একদিন আলাপ-আলোচনার ফল বেরুল।

কলকাতার ছোট বড়, ইংরেজী বাংলা সব কাগজের তরফ

থেকে রাত একটার সময় টেলিগ্রাম বার ক'রে দেওয়া হল।

শংকর ঘুমিয়ে পড়েছিল। শংকরের বাবা তখনো রাত জেগে অফিসের দরকারি কাগজ-পত্তর ঘাঁটছিলেন।

হঠাৎ তাঁর কানে গেল, টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম···

তাড়াতাড়ি বাড়ির লোকটাকে ডেকে বললেন, যা তো বাবা ধৃতরাষ্ট্র, দৌড়ে একখানা টেলিগ্রাম কিনে আন তো। দৌড়ে যা না হলে পাবি না।

রাত একটার সময় ধৃতরাষ্ট্র দৌড় দিল টেলিগ্রাম কেনার জন্যে। টেলিগ্রাম এলে, খবর পড়তে পড়তে শংকরের বাবা আর ঠিক থাকতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি শংকরকে ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেওয়ার জন্যে পাশের ঘরে ছুটে এলেন।

কানের কাছে বাবার গলা, আর পিঠের ওপর বাবার হাত পড়তেই শংকর তো ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাবার দিকে কাঁদো-কাঁদো মুখে তাকালো।

শংকর উঠে বসতেই তিনি বললেন, ঘুমুচ্ছিস কি রে? টেলিগ্রামে কী খবর বেরিয়েছে শুনেছিস? শোন, ব'লে খবরটা পড়তে লাগলেন।

লোকসভায় ও বিধানসভাগুলিতে তুমুল তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে পিরামিডের মাথার সাড়ে-সাত-ইঞ্চি মানুষটিকে ভারতের যে স্থানে যে-ঋতু যখন ভাল, তখন সেই সেই স্থলেই রাখা হইবে। যে কয়টি দিন অতিরিক্ত থাকিবে সেই কয়টি দিন সে কলিকাতা শহরে মনোরম পরিবেশে কাটাইবে। কারণ লোকটির জীবদ্দশার পর কলিকাতা শহরেই মহাত্মা গান্ধীর অনুপম প্রতিমূর্তির মতো তাহারও একটি প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। সেই প্রতি-

মূর্তির নিচে প্রস্তরফলকে তাহার জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ করা হইবে। কলিকাতার মেয়রের সুদৃঢ় বিশ্বাস যে মৃত্যুর পরও লোকটির সুন্দর প্রতিমূর্তিটি নগরের শোভা বর্ধন করিবে।

আগামী কাল হইতে লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে জরুরী আলোচনা সমূহ আবার যথারীতি আরম্ভ হইবে।

•• তখন তিনি এককগাল হেসে•••

ওদিকে হাঙ্গামা হুজ্‌জুত ঝগড়াঝাঁটি যেমন মিটল এদিকে স্কুলেও শংকর পরদিন সকালে একটা সুখবর পেল।

নিখিলেশ্বরবাবুর সংস্কৃতর ক্লাশ হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই শিউনন্দন দরজার সামনে এল, সেক্রেটারী বোলাতা।

সেক্রেটারী বিষণ্নভূষণবাবু শংকরকে ডেকে পাঠিয়েছেন!

আবার কী ব্যাপার কে জানে। নিখিলেশ্বরবাবু তাড়াতাড়ি শংকরকে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

শংকর যখন বিষণ্ণভূষণবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন তিনি একগাল হেসে তাকে বসতে বললেন। তারপর হেড-মাস্টার প্রপন্নপালকবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, আপনিই সুখবরটা শুনিয়ে দিন।

হেডমাস্টারমশাই তার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন, খুব বড একটা সুখবর আছে শংকর।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে তোমার কৃতকার্যের পুরস্কার হিসাবে আমাদের স্কুল পুজোর ছুটি আর গরমের ছুটি ছাড়াও আরেকটা পুজোর ও আরো একটা গরমের ছুটি পাবে। মানে পুরো বছরটাই প্রায় ছুটি। মাস্টারমশাইরা অনেকেই ছুটি ছুটি করছিলেন, তুমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিলে। অবিশ্যি এই বাড়তি ছুটির জন্যে তাঁরা পুরো মাইনেই পাবেন। তাঁদের চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। তা ছাড়া সরকার থেকে তাঁদের জন্যে কিছু উপরি টাকারও ব্যবস্থা করা হবে। এই সব কারণে তোমার কাছে সব মাস্টারমশাইরা কৃতজ্ঞ। তোমাব সাফল্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সব স্কুলও ছুটি পাবে ক'টা দিন।

—হ্যাঁ, আরেকটা কথাও তোমায় জানিয়ে রাখি। সরকার থেকে তোমাকেও একটা বড় রকমের পুরস্কার দেবার কথা চলছে। তুমি দু'-একটা দিনের মধ্যেই জানতে পারবে।

হেডমাস্টারমশাই কথা শেষ করার পর সেক্রেটারীমশাই খুব উৎসাহের সঙ্গে তার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

স্কুল ছুটি হওয়ার আগেই খবরটা ছেলেদের কানে পৌঁছে গেল।

দু'-একটা দিনও লাগল না। সেই দিনই বাড়ি ফিরে শংকর তার নামে একটা মস্ত খামের চিঠি পেল।

চিঠিতে শংকরকে একটা চাকরির জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। চাকরি মানে তেনজিং নোরকের মতো একটা চাকরি। তেনজিং যেমন কি ক'রে পাহাড়ে উঠতে হয় শেখাবে, শংকরও তেমনি কি ক'রে অভিযানে পাড়ি দিতে হয় তার ট্রেনিং দেবে। শংকরকে একটা বড় অভিযান ক্লাবের প্রিন্সিপ্যাল অর্থাৎ অধ্যক্ষ ক'রে দেওয়া হবে। মাইনে অবিশ্যি এখন ন'শো টাকার বেশি দেওয়া যাবে না, তবে পরে ভেবে দেখা যাবে। শংকর যদি রাজী থাকে তো চিঠিতে যেন জানিয়ে দেয়। এ ছাড়া ভারত সরকার শংকরকে একটি স্বর্ণপদক উপহার ও পদ্মশ্রী উপাধি দেবেন।

চিঠিতে খবরটা পেয়ে শংকর একবার শুধু ভাবল, মাত্র ন'শো টাকা পাচ্ছে ব'লে সে যদি দুঃখ করে, তবে খবরটা শুনলে মাস্টারমশাইদের মনে কি দুঃখ হবে, সে কি একবার ভাবতে পারে। সমস্ত মাস্টারমশাইরা মাইনের টাকা আর ভাতা নিয়েও কি শংকরের চেয়ে বেশি পান। কথাটা ভেবে সে বাস্তবিক লজ্জা পেল।

বোকাদা যখন শংকরের চিঠি দেখল তখন বুঝি লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারল না। ' কী করেছে শংকর এই বয়সে! তেনজিং-এরও না ভাত মারা যায় শেষ পর্যন্ত।

বোকাদা শংকরকে ডেকে বলল, দ্যাখ শংকর, সব জায়গায় তো সম্বর্ধনা হল, আর তোর পাড়ার লোক হয়ে আমরা হাত গুটিয়ে থাকব, বলিস কী? আয়, সামনে কোনো একটা ভাল দিন-টিন দেখে আমরা তোর একটা সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করি।

বোকাদার কথা শুনে শংকর খুব লজ্জা পেল। বলল, না বোকাদা। আর সম্বর্ধনার দরকার কি ? অনেকগুলো তো হল।

বোকাদা কিছুতেই শংকরের কথা মানতে রাজী নয়। বলল, তাও হয় নাকি। তুই আমাদের পাড়ার ছেলে, আর আমরা চুপ ক'রে থাকব। লোকে আমাদের গায়ে থুতু দেবে। আচ্ছা, কাকে সভাপতি আর কাকে প্রধান অতিথি করা যায় বল তো ?

শংকর লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল। কী যে বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না। বোকাদা শেষ পর্যন্ত যখন নাছোড়-বান্দা, সে গদগদ হয়ে বলল, আচ্ছা তোমার কথাই রইল। কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হবে—

—কী কথা ? বোকাদা চোখ বড় ক'রে জিজ্ঞেস করে।

—তোমাকে সভাপতি হতে হবে।

—আমি হব সভাপতি ? কী যে বলিস ! বোকাদা ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলে।

—হ্যাঁ, তোমাকেই সভাপতি হতে হবে। না হলে কিন্তু আমি সম্বর্ধনা সভায় থাকব না, এই ব'লে রাখছি।

শংকরের পীড়াপীড়িতে বোকাদা শেষ পর্যন্ত রাজী হল। আরও ঠিক হল হরেনবাবু হবেন প্রধান অতিথি।

রবিবার। ছুটির দিন। সবাই আসতে পারবে।

পাড়ার কাউন্সিলার করুণাতীর্থবাবুর বাড়ির সামনের খোলা মাঠে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন হল।

পাড়ার ছেলে বুড়ো যে যেখানে ছিল সবাই জমা হল।

বোকাদা ধুতি পাঞ্জাবী প'রে হরেনবাবুর পাশের চেয়ারে গম্ভীর মুখে ব'সে আছে। শংকর হরেনবাবুর পাশের চেয়ারে

চুপটি ক'রে লজ্জা লজ্জা মুখে ব'সে রইল। ছোট বোন মিঠুও এসেছে দাদার সঙ্গে।

সভার এক পাশে ছোট-খাট প্রদর্শনীর মতো ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে-জামা, জুতো ব্যাগ শংকর পিরামিডের মাথায় ওঠবার সময় ব্যবহার করেছিল সেইগুলো একটা কাচের বাক্সের মধ্যে রাখা হয়েছে, সবাই যাতে বাইরে থেকে দেখতে পায়। এ ছাড়া যে টেবিল-ক্লথে সে লোকটাকে মুড়েছিল সেটাও রয়েছে একপাশে। শংকরের ছোট বোন মিঠু কাগজে দাদার যে সমস্ত মজার মজার ছবিগুলো বেরিয়েছিল, সেই সব ছবিগুলো কেটে কেটে রেখেছে। একখানাতে শংকরকে মনে হচ্ছে টিকটিকি, একখানাতে আরশোলা, আর একখানাতে একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতন। সেইসব ছবিগুলোও রাখা হয়েছে। ঠিক স্পুটনিকের মধ্যের কুকুরটার মতো। কোথা দিয়ে যে ঘুরছে বেচারা কিছুই বুঝতে পারছে না।

সভাপতি আর প্রধান অতিথির গলায় মালা দেবার পর, শংকরের গলায় মালা দেওয়া হল। কী ভীষণ হাততালি রে বাবা!

বোকাদা কাঁপা-কাঁপা গলায় বুলুর দাদার লিখে-দেওয়া কথাগুলো মুখস্ত ব'লে গেল। হরেনবাবু জিওগ্র্যাফি ক্লাশে যেমন ক'রে পড়ান 'সেই রকম ঢঙে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন।

পাড়ার সবাই শংকরকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলেন। কী যে বলবে শংকর। একটুখানি বলে, আবার একটুখানি থামে। এই ক'রে কোনো রকমে সাড়ে-পাঁচ-মিনিট ব'লে সে ধপাস ক'রে নিজের জায়গায় ব'সে পড়ল। জল

চাইল। শেষকালে বুলুর দাদা উঠলেন। শংকরের উদ্দেশে স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন :

কোথা থেকে শিখে এলে এই যাদু মন্তর
পিরামিডে উঠে ফের নেমে এলে শংকর
হলে তুমি এ পাড়ার তেনজিং নোরকে
বদমাস গুণ্ডাবা শুনে যাবে ভড়কে।
তেনজিং শংকর শংকর তেনজিং
ভয়ে আর ক্ষেপা মোষ আসবে না তেড়ে শিং
সাড়ে-সাত-ইঞ্চির কাছে তুমি শেখ গান
গান শুনে বোকাদাও নাকি বোকা ব'নে যান।
শংকব শংকর মন করো শক্ত
ফুচকা ও হজমির হয়ে পড়ো ভক্ত
খাওযাটাই পৃথিবীতে সব নয জেনে যাও
খিদে পেলে এইসব খাদ্যই মেনে নাও।
যা-দেখালে যা-শেখালে অদ্ভুত অদ্ভুত
এত বড কাজটায কোনখানে নেই খুঁত
যা-বলেছ যা কবেছ তাজ্জব্ তাজ্জব্
দেখে লোকে ছুটে আসে ফেলে রেখে কাজ সব।

কানে তালা-লাগানো হাততালির মধ্যে পিলে-চমকানো হাসি হাসতে হাসতে রাত দশটার সময় সবাই সভা থেকে বেরুল।